قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ
يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

سُوْرَةُ مَرْيَمَ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ ثَمَانٌ وَّتِسْعُوْنَ اٰيَةً وَّسِتُّ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

كٓهيعٓصٓ ﴿١﴾ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ﴿٢﴾ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ
نِدَاءً خَفِيًّا ﴿٣﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ
شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿٤﴾ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن
وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ﴿٥﴾ يَرِثُنِي
وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٦﴾ يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ
بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ﴿٧﴾ قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ
يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ
عِتِيًّا ﴿٨﴾ قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ
مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ﴿٩﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً قَالَ
آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴿١٠﴾ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ
مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿١١﴾

(১১০) বলুন ঃ আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ। অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার এবাদতে কাউকে শরীক না করে।

সূরামারইয়াম

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ৯৮

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

(১) কাফ-হা-ইয়া-আইন-সাদ। (২) এটা আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি, (৩) যখন সে তাঁর পালনকর্তাকে আহবান করেছিল নিভৃতে। (৪) সে বলল, হে আমার পালনকর্তা আমার অস্থি বয়স-ভারাবনত হয়েছে; বার্ধক্যে মস্তক সুশুভ্র হয়েছে; হে আমার পালনকর্তা! আপনাকে ডেকে আমি কখনও বিফলমনোরথ হইনি। (৫) আমি ভয় করি আমার পর আমার স্বগোত্রকে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা; কাজেই আপনি নিজের পক্ষ থেকে আমাকে একজন কর্তব্য পালনকারী দান করুন। (৬) সে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে ইয়াকুব-বংশের এবং হে আমার পালনকর্তা, তাকে করুন সন্তোষজনক। (৭) হে যাকারিয়া, আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহ্ইয়া। ইতিপূর্বে এই নামে আমি কারও নামকরণ করিনি। (৮) সে বলল ঃ হে আমার পালনকর্তা কেমন করে আমার পুত্র হবে অথচ আমার স্ত্রী যে বন্ধ্যা, আর আমিও যে বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে উপনীত। (৯) তিনি বললেন ঃ এমনিতেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলে দিয়েছেন ঃ এটা আমার পক্ষে সহজ। আমি তো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি এবং তুমি কিছুই ছিলে না। (১০) সে বলল ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে একটি নির্দশন দিন। তিনি বললেন ঃ তোমার নির্দশন এই যে, তুমি সুস্থ অবস্থায় তিন দিন মানুষের সাথে কথাবার্তা বলবে না। (১১) অতঃপর সে কক্ষ থেকে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে এল এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতে বলল ঃ

সমান হবে, কিন্তু ন্যায়বিচারের দাঁড়ি-পাল্লায় কোন ওজনই থাকবে না।

جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ – فردوس এর অর্থ সবুজে ঘেরা উদ্যান। এটি আরবী শব্দ, না অনারব এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। যারা অনারব বলেন, তারাও ফারসী রোমী, না সুরইয়ানী ইত্যাদি সম্পর্কে নানা মত পোষণ করেন।

বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা যখন আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা কর, তখন জান্নাতুল-ফেরদাউসের প্রার্থনা কর। কেননা, এটা জান্নাতের সর্বোৎকৃষ্ট স্তর। এর উপরেই আল্লাহ্‌র আরশ এবং এখান থেকেই জান্নাতের সব নহর প্রবাহিত হয়েছে।— (কুরতুবী)

لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতের এ স্থানটি তাদের জন্য অক্ষয় ও চিরস্থায়ী নেয়ামত। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা এ আদেশ জারি করে দেবেন, যে জান্নাতে প্রবেশ করেছে, তাকে সেখান থেকে কখনও বের করা হবে না। কিন্তু এখানে একটি আশংকা ছিল এই যে, এক জায়গায় থাকতে থাকতে অতিষ্ঠ হয়ে যাওয়া মানুষের একটি স্বভাব। সে স্থান পরিবর্তনের ইচ্ছা করে। যদি জান্নাতের বাইরে কোথাও যাওয়ার অনুমতি না থাকে, তবে জান্নাতও একটি কয়েদখানার মত মনে হতে থাকবে। আলোচ্য আয়াতে এর জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, জান্নাতকে অন্যান্য গৃহের আলোকে দেখা মূর্খতা বৈ নয়। যে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে,জান্নাতের নেয়ামত ও চিত্তাকর্ষক পরিবেশের সামনে দুনিয়াতে দেখা ও ব্যবহার করা বস্তুসমূহ তার কাছে নগণ্য ও তুচ্ছ মনে হবে। জান্নাত থেকে বাইরে যাওয়ার কল্পনাও কোন সময় মনে জাগবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হাদীসে বর্ণিত শানে-নুযুল থেকে সূরা কাহ্‌ফের শেষ আয়াতে উল্লেখিত বাক্য। وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا সম্বন্ধে জানা যায় যে, এখানে উল্লেখিত শিরক দ্বারা "গোপন শিরক" অর্থাৎ, রিয়া তথা লোক দেখানো মনোবৃত্তি বোঝানো হয়েছে।

ইমাম হাকেম তাঁর মুস্তাদরাকে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক মুসলমান আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ করত এবং মনে মনে কামনা করত যে, জনসমাজে শৌর্য-বীর্য প্রচারিত হোক। তারই সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (এ থেকে জানা গেল যে, জেহাদে এরূপ নিয়ত করলে জেহাদের সওয়াব পাওয়া যায় না।)

'ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে আবিদ্দুনিয়া' 'কিতাবুল ইখলাসে' তাউস থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার জনৈক সাহাবী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে বললেন ঃ আমি মাঝে মাঝে যখন কোন সৎকর্ম সম্পাদনের অথবা এবাদতের উদ্যোগ গ্রহণ করি, তখন আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টিই থাকে আমার উদ্দেশ্য ; কিন্তু সাথে সাথে এ কামনাও মনে জাগে যে, লোকেরা আমার কাজটি দেখুক। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একথা শুনে চুপ করে রইলেন। অবশেষে উল্লেখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়। আবু নঈম 'তারীখে-আসাকির' গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে লিখেছেন ঃ জুনদুব ইবনে সুহায়েব যখন নামায পড়তেন, রোযা রাখতেন অথবা দান-খয়রাত করতেন এবং এসব আমলের কারণে লোকদেরকে তার প্রশংসা করতে দেখতেন, তখন মনে মনে খুব আনন্দিত হতেন। ফলে আমল আরও বাড়িয়া দিতেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়।

এসব রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, আয়াতে রিয়াকারীর গোপন শিরক থেকে বারণ করা হয়েছে। আমল আল্লাহ্‌র উদ্দেশে হলেও যদি তার সাথে কোনরূপ সুখ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির বাসনা থাকে, তবে তাও এক প্রকার গোপন শিরক। এর ফলে মানুষের আমল বরবাদ এবং ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু অন্য কতিপয় সহীহ্ হাদীস থেকে এর বিপরীতও জানা যায়। উদাহরণতঃ তিরমিযী হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ একবার তিনি রসূলুল্লাহ্-এর কাছে আরয করলেন, আমি মাঝে মাঝে আমার ঘরের ভিতরে জায়নামাযে (নামাযরত) থাকি। হঠাৎ কোন ব্যক্তি এসে গেলে আমার কাছে ভাল লাগে যে, সে আমাকে নামাযরত অবস্থায় দেখেছে। এটা কি রিয়া হবে? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ আবু হোরায়রা, আল্লাহ্ তোমার প্রতি রহম করুন। এমতাবস্থায় তুমি দু'টি সওয়াব পাবে। একটি তোমার সে গোপন আমলের জন্য যা তুমি পূর্ব থেকে করছিলে এবং দ্বিতীয়টি তোমার প্রকাশ্য আমলের জন্যে যা লোকটি আসার পর হয়েছে। (এটা রিয়া নয়।)

সহীহ্-মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে, একবার হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলুন, যে কোন সৎকর্ম করার পর মানুষের মুখে তার প্রশংসা শোনে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ تلك عاجل بشرى المؤمن অর্থাৎ, এটা তো মুমিনের নগদ সুসংবাদ (যে তার আমল আল্লাহ্ তাআলা কবুল করেছেন এবং বান্দাদের মুখে তার প্রশংসা করিয়েছেন।)

তফসীর মাযহারীতে বলা হয়েছে, প্রথমোক্ত রেওয়ায়েতের তাৎপর্য এই যে, নিজের আমল দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির সাথে সৃষ্টজীবের সন্তুষ্টি অথবা নিজের সুখ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির নিয়তকে শরীক করে নেয়া এমনকি, লোকমুখে প্রশংসা শুনে আমল আরও বাড়িয়ে দেয়া। এটা নিঃসন্দেহে রিয়া ও গোপন শিরক।

তিরমিযী ও মুসলিমে বর্ণিত শেষোক্ত রেওয়ায়েতগুলোর সম্পর্ক হল সে অবস্থার সাথে যে, আমল খাঁটিভাবে আল্লাহ্‌র জন্যেই হয়ে থাকে, লোকমুখে সুখ্যাতি ও প্রশংসার প্রতি ভ্রূক্ষেপ থাকে না। অতঃপর যদি আল্লাহ্ তাআলা অনুগ্রহ করে লোকের মাঝে তার প্রসিদ্ধি সম্পন্ন করে দেন এবং মানুষের মুখ দিয়ে প্রশংসা করিয়ে দেন, তবে রিয়ার সাথে এ আমলের কোন সম্পর্ক নেই। এটা মুমিনের জন্যে (আমল কবুল হওয়ার) অগ্রিম সুসংবাদ। এভাবে বাহ্যতঃ পরস্পর বিরোধী উভয় প্রকার রেওয়ায়েতের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়ে যায়।

রিয়ার অশুভ পরিণতি এবং তজ্জন্যে হাদীসের কঠোর সতর্কবাণী ঃ হযরত মাহমুদ ইবনে লবীদ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ আমি তোমাদের সম্পর্কে যে বিষয় সর্বাধিক আশঙ্কা করি, তা হচ্ছে ছোট শিরক। সাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, ছোট শিরক কি? তিনি বললেন ঃ রিয়া।—(আহমদ)

বায়হাকী শোয়াবুল-ঈমান গ্রন্থে হাদীসটি উদ্ধৃত করে তাতে অতিরিক্ত আরও বর্ণনা করেছেন যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলা যখন বান্দাদের কাজকর্মের প্রতিদান দেবেন, তখন রিয়াকার লোকদেরকে বলবেন ঃ তোমরা তোমাদের কাজের প্রতিদান নেয়ার জন্যে তাদের কাছে যাও, যাদেরকে দেখানোর উদ্দেশে তোমরা কাজ করেছিলে। এরপর দেখ, তাদের কাছে তোমাদের জন্যে কোন প্রতিদান আছে কি না।'

হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন যে, আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ আমি শরীকদের সাথে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ঊর্ধ্বে। যে ব্যক্তি কোন সৎকর্ম করে এবং তাতে আমার সাথে অন্যকেও শরীক করে, আমি সেই আমল শরীকের জন্যে ছেড়ে দেই। অন্য এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, আমি সেই আমল থেকে মুক্ত ; সে আমলকে খাঁটিভাবে আমি তার জন্যেই করে দেই, যাকে সে আমার সাথে শরীক করেছিল।—(মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনছেন, যে ব্যক্তি সুখ্যাতি লাভের জন্যে সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাআলাও তার সাথে এমনি ব্যবহার করেন ; যার ফলে সে ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত হয়ে যায়।—(আহমদ, বায়হাকী, মাযহারী)

তফসীর কুরতুবীতে আছে, হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-কে এখলাস ও রিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ এখলাস দ্বারা হচ্ছে সৎ ও ভাল কর্মের গোপনীয়তা পছন্দ করা এবং মন্দ কর্মের গোপনীয়তা পছন্দ না করা। এরপর যদি আল্লাহ্ তাআলা তোমার আমল মানুষের কাছে প্রকাশ করে দেন, তবে তুমি একথা বল ঃ হে আল্লাহ্, এটা আপনার অনুগ্রহ ও কৃপা ; আমার কর্ম ও প্রচেষ্টার ফল নয়।

হাকীম তিরমিযী হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) শিরকের আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন ঃ هو فيكم اخفى من دبيب অর্থাৎ, পিঁপড়ার নিঃশব্দ গতির মতই শিরক তোমাদের মধ্যে গোপনে অনুপ্রবেশ করে। তিনি আরও বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে একটি উপায় বলে দিচ্ছি যা করলে তোমরা বড় শিরক ও ছোট শিরক (অর্থাৎ, রিয়া) থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে। তোমরা দৈনিক তিনবার এই দোয়া পাঠ করো اللّٰهم انى اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلمه

সূরা কাহ্‌ফের কতিপয় ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য ঃ হযরত আবু দ্দারদা বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা কাহ্‌ফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ রাখবে, সে দাজ্জালের ফেৎনা থেকে নিরাপদ থাকবে। (মুসলিম, আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী)

জনৈক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের কাছে বলল ঃ আমি মনে মনে ঘুম থেকে জেগে নামায পড়তে ইচ্ছা করি ; কিন্তু ঘুম প্রবল হয়ে যায়। তিনি বললেন ঃ তুমি যখন ঘুমাতে যাও তখন সূরা কাহ্‌ফের শেষ আয়াতগুলো قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত পাঠ কর। এর ফলে তুমি যখন জাগার ইচ্ছা করবে, আল্লাহ্ তাআলা তখনই তোমাকে জাগিয়ে দেবেন।—(ছালবী)

একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ ঃ ইবনে আরাবী বলেন ঃ আমাদের শায়খ তুরতুসী বলতেন ঃ তোমার মূল্যবান জীবনের সময়গুলো যেন সমসাময়িকদের সাথে প্রতিযোগিতা ও বন্ধু-বান্ধবের মেলামেশার মধ্যেই অতিবাহিত হয়ে না যায়। দেখ, আল্লাহ্ তাআলা এই আয়াত দ্বারা তাঁর বর্ণনা সমাপ্ত করেছেন ঃ

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন

সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার এবাদতে যেন কাউকে শরীক না করে।—(কুরতুবী)

সূরা কাহ্‌ফে ইতিহাসের একটি বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণিত হয়েছিল। সূরা মারইয়ামেও এমনি ধরনের অত্যাশ্চর্য একটা বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হয়েছে। সম্ভবতঃ এ সম্পর্কের কারণেই সূরা-কাহ্‌ফের পরে সূরা মারইয়ামকে স্থান দেয়া হয়েছে।— (রূহুল-মা'আনী)

সূরা মারইয়াম

كٓهٰيٰعٓصٓ এগুলো খণ্ডিত ও অবোধগম্য বর্ণমালার অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। বান্দার জন্য এর অর্থ অন্বেষণ করাও সমীচীন নয়।

نِدَآءً خَفِيًّا এতে জানা গেল যে, দোয়া অনুচ্চৈঃস্বরে ও গোপনে করাই উত্তম।

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের বর্ণনা মতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ ان خير الذكر الخفى وخير الرزق ما يكفى অর্থাৎ, অনুচ্চ যিকরই সর্বোত্তম এবং যথেষ্ট হয়ে যায় এমন যিকরই শ্রেষ্ঠ। (অর্থাৎ, যা প্রয়োজনের তুলনায় বেশী হয় না এবং কমও হয় না।) – (কুরতুবী)

وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا অস্থির দুর্বলতা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, অস্থিই দেহের খুঁটি। অস্থির দুর্বলতা সমস্ত দেহের দুর্বলতার নামান্তর। اشتعال এর শাব্দিক অর্থ প্রজ্জ্বলিত হওয়া, এখানে চুলের শুভ্রতাকে আগুনের আলোর সাথে তুলনা করে তা সমস্ত মস্তকে ছড়িয়ে পড়া বোঝানো হয়েছে।

দোয়া করতে গিয়ে নিজের অভাবগ্রস্ততা প্রকাশ করা মোস্তাহাব ঃ এখানে দোয়ার পূর্বে হযরত যাকারিয়া (আঃ) তাঁর দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন। এর একটি কারণ এই যে, এমতাবস্থায় সন্তান কামনা না করাই বিধেয় ছিল। ইমাম কুরতুবী তাঁর তফসীর গ্রন্থে দ্বিতীয় কারণ বর্ণনা করেছেন এই যে, দোয়া করার সময় নিজের দুর্বলতা, দুর্দশা ও অভাবগ্রস্ততা উল্লেখ করা দোয়া কবুল হওয়ার পক্ষে সহায়ক।

الْمَوَالِيَ এটা مولى এর বহুবচন। আরবী ভাষায় এর অর্থ বহুবিধ। তন্মধ্যে এক অর্থ চাচাত ভাই ও স্বজন। এখানে উদ্দেশ্য তাই।

পয়গম্বরগণের ধন-সম্পদে উত্তরাধিকারিত্ব চলে না ঃ يَرِثُنِيْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ অধিকসংখ্যক আলেমদের সর্বসম্মতিক্রমে এখানে উত্তরাধিকারিত্বের অর্থ আর্থিক উত্তরাধিকারিত্ব নয়। কেননা, প্রথমতঃ হযরত যাকারিয়ার কাছে এমন কোন অর্থ সম্পদ ছিল বলেই প্রমাণ নেই, যে কারণে চিন্তিত হবেন যে, এর উত্তরাধিকারী কে হবে! একজন পয়গম্বরের পক্ষে এরূপ চিন্তা করাও অবান্তর। তাছাড়া সাহাবায়ে কেরামের ইজমা তথা ঐকমত্য সম্বলিত এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

–"নিশ্চিতই আলেমগণ পয়গম্বরগণের ওয়ারিশ। পয়গম্বরগণ কোন দীনার ও দিরহাম রেখে যান না; বরং তাঁরা ইল্‌ম ও জ্ঞান ছেড়ে যান। যে ব্যক্তি ইল্‌ম হাসিল করে, সে বিরাট সম্পদ হাসিল করে।" — '(আহ্‌মদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, তিরমিযী)

স্বয়ং আলোচ্য আয়াতে এরপর يَرِثُنِيْ বাক্যের وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ যোগ এরই প্রমাণ যে, এখানে আর্থিক উত্তরাধিকারিত্ব বোঝানো হয়নি। কেননা, যে পুত্রের জন্মলাভের জন্যে দোয়া করা হচ্ছে, তার পক্ষে ইয়াকূব বংশের আর্থিক উত্তরাধিকারী হবে, তাতে তাদের নিকটবর্তী আত্মীয়স্বজনরা এবং তারা হচ্ছে সেসব موالى তথা স্বজন, যাদের উল্লেখ আয়াতে করা হয়েছে; তারা নিঃসন্দেহে আত্মীয়তায় হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আঃ) থেকে অধিক নিকটবর্তী। নিকটবর্তীর বর্তমানে দূরবর্তীর উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করা উত্তরাধিকার আইনের পরিপন্থী।

وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا আয়াতে সম্পদের উত্তরাধিকারিত্ব বোঝানো হয়নি।

لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا – سمى শব্দের অর্থ সমনামও হয় এবং সমতুল্যও হয়। এখানে প্রথম অর্থ নেয়া হলে আয়াতের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, তাঁর পূর্বে 'ইয়াহ্‌ইয়া' নামে কারও নামকরণ করা হয়নি। নামের এই অনন্যতা ও অভূতপূর্বতাও কতক বিশেষ গুণে তাঁর অনন্যতার ইঙ্গিতবহ ছিল। তাই তাঁকে তাঁর বিশেষ গুণে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি দ্বিতীয় অর্থ নেয়া হয়, তবে উদ্দেশ্য এই যে, তাঁর কতক বিশেষ গুণ ও অবস্থা পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের কারও মধ্যে ছিল না। সেসব বিশেষ গুণে তিনি তুলনাহীন ছিলেন। উদাহরণতঃ চিরকুমার হওয়া ইত্যাদি। এতে জরুরী নয় যে, ইয়াহ্‌ইয়া (আঃ) পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের চাইতে সর্বাবস্থায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কেননা, তাঁদের মধ্যে হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ ও মূসা কলীমুল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত ও সুবিদিত।—(মাযহারী)

عِتِيًّا শব্দটি عتو থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ প্রভাবান্বিত না হওয়া। এখানে অস্থির শুষ্কতা বোঝানো হয়েছে। سَوِيًّا শব্দের অর্থ সুস্থ। শব্দটি একথা বোঝানোর জন্যে যুক্ত করা হয়েছে যে, যাকারিয়া (আঃ)-এর কোন মানুষের সাথে কথা না বলার এ অবস্থাটি কোন রোগবশতঃ ছিল না। এ কারণেই আল্লাহ্‌র যিকর ও এবাদতে তাঁর জিহ্বা তিন দিনই পূর্ববৎ খোলা ছিল; বরং এ অবস্থা মু'জেযা ও গর্ভসঞ্চারের নিদর্শন স্বরূপই প্রকাশ পেয়েছিল। حنانا এর শাব্দিক অর্থ হৃদয়ের কোমলতা ও দয়ার্দ্রতা। এটা হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আঃ)-কে স্বতন্ত্রভাবে দান করা হয়েছিল।

يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ۖ وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴿١٢﴾ وَّحَنَانًا
مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ۖ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿١٣﴾ وَّبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ
جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿١٤﴾ وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ
يُبْعَثُ حَيًّا ﴿١٥﴾ وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ ۘ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا
مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿١٦﴾ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ۖ فَاَرْسَلْنَآ
اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾ قَالَتْ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ
بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴿١٨﴾ قَالَ اِنَّمَآ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ۖ
لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾ قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّلَمْ
يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾ قَالَ كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ
هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ۚ وَلِنَجْعَلَهٗٓ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ
اَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿٢١﴾ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٢﴾
فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ يٰلَيْتَنِيْ مِتُّ
قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ﴿٢٣﴾ فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَآ
اَلَّا تَحْزَنِيْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿٢٤﴾ وَهُزِّيْٓ
اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿٢٥﴾

(১২) হে ইয়াহ্ইয়া দৃঢ়তার সাথে এই গ্রন্থ ধারণ কর। আমি তাকে শৈশবেই বিচারবুদ্ধি দান করেছিলাম। (১৩) এবং নিজের পক্ষ থেকে আগ্রহ ও পবিত্রতা দিয়েছি। সে ছিল পরহেযগার। (১৪) পিতা-মাতার অনুগত এবং সে উদ্ধত, নাফরমান ছিল না। (১৫) তার প্রতি শান্তি — যেদিন সে জন্মগ্রহণ করে এবং যেদিন মৃত্যুবরণ করবে এবং যেদিন জীবিতাবস্থায় পুনরুত্থিত হবে। (১৬) এই কিতাবে মারইয়ামের কথা বর্ণনা করুন, যখন সে তার পরিবারের লোকজন থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল। (১৭) অতঃপর তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্যে সে পর্দা করল। অতঃপর আমি তার কাছে আমার রূহ প্রেরণ করলাম, সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল। (১৮) মারইয়াম বলল : আমি তোমা থেকে দয়াময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করি যদি তুমি আল্লাহ্ভীরু হও। (১৯) সে বলল : আমি তো শুধু তোমার পালনকর্তা প্রেরিত, যাতে তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করে যাব। (২০) মারইয়াম বলল : কিরূপে আমার পুত্র হবে, যখন কোন মানব আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও কখনও ছিলাম না? (২১) সে বলল : এমনিতেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলেছেন, এটা আমার জন্যে সহজসাধ্য এবং আমি তাকে মানুষের জন্যে একটি নিদর্শন ও আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ করতে চাই। এটা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার। (২২) অতঃপর তিনি গর্ভে সন্তান ধারণ করলেন এবং তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেলেন। (২৩) প্রসব বেদনা তাঁকে এক খেজুর-বৃক্ষ-মূলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। তিনি বললেন : হায়, আমি যদি কোনরূপে এর পূর্বে মরে যেতাম এবং মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে, যেতাম! (২৪) অতঃপর ফেরেশতা তাকে নিম্নদিক থেকে আওয়ায দিলেন যে, তুমি দুঃখ করো না। তোমার পালনকর্তা তোমার পায়ের তলায় একটি নহর জারি করেছেন। (২৫) আর তুমি নিজের দিকে খেজুর গাছের কাণ্ডে নাড়া দাও; তা থেকে তোমার উপর সুপক্ক খেজুর পতিত হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

انْتَبَذَتْ শব্দটি نبذ থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ দূরে নিক্ষেপ করা। انتباذ এর অর্থ হল জনসমাবেশ থেকে সরে দূরে চলে যাওয়া। مَكَانًا شَرْقِيًّا – অর্থাৎ, পূর্বদিকের কোন নির্জন স্থানে চলে গেলেন। নির্জন স্থানে যাওয়ার কি কারণ ছিল, সে সম্পর্কে সম্ভাবনা ও উক্তি বিভিন্নরূপ বর্ণিত আছে। কেউ বলেন : গোসল করার জন্যে নির্জন স্থানে গিয়েছিলেন। কেউ বলেন : অভ্যাস অনুযায়ী এবাদতে মশগুল হওয়ার জন্যে কক্ষের পূর্বদিকস্থ কোন নির্জন স্থানে গমন করেছিলেন। কুরতুবীর মতে দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি উত্তম। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, এ কারণেই খ্রীষ্টানরা পূর্বদিককে তাদের কেবলা করেছে এবং তারা পূর্বদিকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকে।

فَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهَا رُوْحَنَا –অধিকসংখ্যক তফসীরবিদগণের মতে রূহ বলে জিবরাঈলকে বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন : স্বয়ং ঈসা (আঃ)–কেই বোঝানো হয়েছে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা মারইয়ামের গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী মানবের প্রতিকৃতি তার সামনে উপস্থিত করে দেন। কিন্তু এখানে প্রথম উক্তি অগ্রগণ্য। পরবর্তী বাক্যাবলী থেকে এরই সমর্থন পাওয়া যায়।

فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا –ফেরেশতাকে তার আসল আকৃতিতে দেখা মানুষের জন্যে সহজ নয়— এতে কঠিন ভীতির সঞ্চার হয়; যেমন স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হেরা গিরিগুহায় এবং পরবর্তীকালেও এরূপ ভয়-ভীতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। এ কারণে হযরত জিবরাঈল মারইয়ামের সামনে মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেন। মারইয়াম যখন পর্দার ভেতর আগত একজন মানুষকে নিকটে দেখতে পেলেন, তখন তার উদ্দেশ্য অসৎ বলে আশঙ্কা করলেন। তাই বললেন :

اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ –আমি তোমাদের থেকে আল্লাহ্ রহমানের আশ্রয় প্রার্থনা করি। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, জিবরাঈল একথা শুনে [আল্লাহ্র কথা শুনে] আল্লাহ্র নামের সম্মানার্থে কিছুটা পেছনে সরে গেলেন।

اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا — এ বাক্যটি এমন, যেমন— কেউ কোন জালেমের কাছে অপারগ হয়ে এভাবে ফরিয়াদ করে : যদি তুমি ঈমানদার হও, তবে আমার প্রতি জুলুম করো না। এ জুলুমে বাধা দেয়ার জন্যে তোমার ঈমান যথেষ্ট হওয়া উচিত। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্কে ভয় করা এবং এই অপকর্ম থেকে বিরত থাকা তোমার জন্যে সমীচীন। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : এ বাক্যটি আতিশয্য বোঝাবার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, যদি তুমি আল্লাহ্ভীরু হও, তবুও আমি তোমার থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করি। এর বিপরীত হলে ব্যাপার সুস্পষ্ট। — (মাযহারী)

মৃত্যু কামনার বিধান : মারইয়ামের মৃত্যু-কামনা পার্থিব দুঃখের কারণে হয়ে থাকলে ভাবাবেগে প্রাধান্যকে এর ওযর বলা হবে। এ ক্ষেত্রে মানুষ সর্বতোভাবে আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধের আওতাধীন থাকে না। পক্ষান্তরে যদি মারইয়াম ধর্মের দিক চিন্তা করে মৃত্যু কামনা করে থাকেন, অর্থাৎ, মানুষ দুর্নাম রটাবে এবং সম্ভবতঃ এর মোকাবেলায় আমি ধৈর্যধারণ করতে পারব না, ফলে বেছবর হওয়ার গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ব। মৃত্যু হলে এ গোনাহ্ থেকে বেঁচে যেতাম, তবে এরূপ মৃত্যু-কামনা নিষিদ্ধ নয়।

فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا ۙ
فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴿٢٦﴾
فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۖ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ﴿٢٧﴾
يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿٢٨﴾
فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٢٩﴾
قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿٣٠﴾ وَجَعَلَنِي
مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ
حَيًّا ﴿٣١﴾ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿٣٢﴾ وَالسَّلَامُ
عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴿٣٣﴾ ذَٰلِكَ
عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٣٤﴾ مَا كَانَ
لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ ۖ سُبْحَانَهُ ۖ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ
لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٣٥﴾ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۗ هَٰذَا
صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٣٦﴾ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ
لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٣٧﴾ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ
يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَٰكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٣٨﴾

(২৬) যখন আহার কর, পান কর এবং চক্ষু শীতল কর। যদি মানুষের মধ্যে কাউকে তুমি দেখ, তবে বলে দিও ঃ আমি আল্লাহ্‌র উদ্দেশে রোযা মানত করেছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সাথে কথা বলব না। (২৭) অতঃপর তিনি সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হলেন। তারা বলল ঃ হে মারইয়াম, তুমি একটি অঘটন ঘটিয়ে বসেছ। (২৮) হে হারূন-ভাগিনী, তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিণী। (২৯) অতঃপর তিনি হাতে সন্তানের দিকে ইঙ্গিত করলেন। তারা বলল ঃ যে কোলের শিশু তার সাথে আমরা কেমন করে কথা বলব? (৩০) সন্তান বলল ঃ আমি তো আল্লাহ্‌র দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। (৩১) আমি যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে। (৩২) এবং জননীর অনুগত থাকতে এবং আমাকে তিনি উদ্ধত ও হতভাগ্য করেননি। (৩৩) আমার প্রতি সালাম যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উত্থিত হব। (৩৪) এ-ই মারইয়ামের পুত্র ঈসা। সত্যকথা, যে সম্পর্কে লোকেরা বিতর্ক করে। (৩৫) আল্লাহ্‌ এমন নন যে, সন্তান গ্রহণ করবেন, তিনি পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা, তিনি যখন কোন কাজ করা সিদ্ধান্ত করেন, তখন একথাই বলেন ঃ 'হও' এবং তা হয়ে যায়। (৩৬) তিনি আরও বললেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্‌ আমার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তা। অতএব, তোমরা তার এবাদত কর। এটা সরল পথ। (৩৭) অতঃপর তাদের মধ্যে দলগুলো পৃথক পৃথক পথ অবলম্বন করল। সুতরাং মহাদিবস আগমনকালে কাফেরদের জন্যে ধ্বংস। (৩৮) সেদিন তারা কি চমৎকার শুনবে এবং দেখবে, যেদিন তারা আমার কাছে আগমন করবে। কিন্তু আজ জালেমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, মারইয়ামকে বলা হয়েছে ঃ তুমি বলে দিও, আমি মৌনতাবলম্বনের মানত করেছি। অথচ বাস্তবে মারইয়াম কোন মানত করেননি। এটা কি মিথ্যা বলার শিক্ষা নয়? উত্তর এই যে, এ শিক্ষার অর্থ হচ্ছে তুমি মানতও করে নিও এবং তা প্রকাশ করে দিও।

মৌনতার রোযা ইসলামী শরীয়তে রহিত হয়ে গেছে ঃ ইসলাম-পূর্বকালে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত মৌনতা অবলম্বন করা এবং কারও সাথে কথা না বলার রোযাও এবাদতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইসলাম একে রহিত করে মন্দ কথাবার্তা, গালিগালাজ,মিথ্যা, পরনিন্দা ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকাকেই জরুরী করে দিয়েছে। সাধারণ কথাবার্তা ত্যাগ করা ইসলামে কোন এবাদত নয়। তাই এর মানত করাও জায়েয নয়। আবু দাউদের রেওয়ায়েতে আছে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন ঃ لايتم بعد احتلام ولاصمات يوم الى الليل অর্থাৎ, সন্তান সাবালক হওয়ার পর পিতা মারা গেলে তাকে এতীম বলা হবে না এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মৌনতা অবলম্বন করা কোন এবাদত নয়। প্রসব বেদনায় পানি ও খেজুরের ব্যবহার চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেও উপকারী। আহার ও পান করার আদেশ বাহ্যতঃ অনুমতি প্রদানের অর্থে বোঝা যায়।

পুরুষ ব্যতীত শুধু নারী থেকে সন্তান হওয়া যুক্তি বিরুদ্ধ নয় ঃ পুরুষের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব করা একটি মু'জেযা। মু'জেযায় যত অসম্ভাব্যতাই থাকুক, তাতে দোষ নেই; বরং এতে অলৌকিকতা গুণটি আরও বেশী করে প্রকাশ পায়। কিন্তু এতে তেমন কোন অসম্ভাব্যতাও নেই। কারণ, চিকিৎসা শাস্ত্রের বর্ণনা অনুযায়ী নারীর বীর্যে ধারণশক্তির সাথে সাথে কারক শক্তিও রয়েছে। তাই যদি এই কারকশক্তি আরও বেড়ে গিয়ে সন্তান জন্মের কারণ হয়ে যায়, তবে তা তেমন অসম্ভব ব্যাপার নয়।– (বয়ানুল-কোরআন)

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা মারইয়ামকে খেজুরের গাছ নাড়া দিতে আদেশ করেছেন। অথচ কোনরূপ নাড়া ছাড়াই আপনা-আপনি কোলে খেজুর পতিত হওয়াও আল্লাহ্‌র কুদরতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এতে বোঝা যায় যে, রিযিক হাসিলের জন্যে চেষ্টা ও পরিশ্রম করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়।— (রূহুল-মা'আনী)

سَرِيًّا এর আভিধানিক অর্থ ছোট নহর। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর কুদরত দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে একটি ছোট নহর জারী করে দেন, অথবা জিবরাঈলের মাধ্যমে জারী করিয়ে দেন। উভয় প্রকার রেওয়ায়েতই রয়েছে। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, মারইয়ামের সান্ত্বনার উপকরণাদি উল্লেখ করার সময় প্রথমে পানি ও পরে খাদ্য তথা খেজুরের উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এগুলো ব্যবহারের কথা বলতে গিয়ে প্রথমে খাদ্য ও পরে পানির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

فَكُلِي وَاشْرَبِي কারণ সম্ভবতঃ এই যে, মানুষ স্বভাবগতভাবেই আহারের পূর্বে পানি যোগাড় করে; বিশেষতঃ ঐ খাদ্যের বেলায় যা খাওয়ার পর পিপাসিত হওয়া নিশ্চিত। কিন্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রথমে খাদ্যবস্তু আহার করে ও পরে পানি পান করে।— (রূহুল-মা'আনী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ বাক্য থেকে বাহ্যতঃ এ কথাই বোঝা যায় যে, অদৃশ্য সুসংবাদের মাধ্যমে মারইয়াম যখন নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁকে দুর্নাম ও লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করবেন, তখন নিজেই

সদ্যজাত শিশুকে নিয়ে ঘরে ফিরে এলেন। কতদিন পরে ফিরে এলেন, এ সম্পর্কে ইবনে আসাকির হযরত ইবনে আব্বাস থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মারইয়াম সন্তান প্রসবের চল্লিশ দিন পর নিফাস থেকে পাক হয়ে ঘরে ফিরে আসেন।—(রূহুল-মা'আনী)

شَيْئًا فَرِيًّا আরবী ভাষায় فرى শব্দের আসল অর্থ কর্তন করা ও চিরে ফেলা। যে কাজ কিংবা বস্তু প্রকাশ পেলে অসাধারণ কাটাকাটি হয়, তাকে فرى বলা হয়। আবু হাইয়্যান বলেন ঃ প্রত্যেক বিরাট বিষয়কে فرى বলা হয় — ভালোর দিক দিয়ে বিরাট হোক কিংবা মন্দের দিক দিয়ে। এখানে শব্দটি বিরাট মন্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মন্দের দিক দিয়ে অনন্য ও বিরাট বস্তুর জন্যেই শব্দটির ব্যবহার সুবিদিত।

يَا أُخْتَ هَارُونَ হযরত মূসা (আঃ)-এর ভাই ও সহচর হযরত হারূন (আঃ) মারইয়ামের আমলের শত শত বছর পূর্বে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। এখানে মারইয়ামকে হারূন-ভগ্নি বলা বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে শুদ্ধ হতে পারে না। হযরত মুগীরা ইবনে শো'বাকে যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নাজরানবাসীদের কাছে প্রেরণ করেন, তখন তারা প্রশ্ন করে যে, তোমাদের কোরআনে হযরত মারইয়ামকে হারূন-ভগিনী বলা হয়েছে। অথচ হারূন (আঃ) তার অনেক শতাব্দী পূর্বে দুনিয়া থেকে চলে যান। হযরত মুগীরা এ প্রশ্নের উত্তর জানতেন না। ফিরে এসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে ঘটনা ব্যক্ত করলে তিনি বললেন ঃ তুমি বলে দিলে না কেন যে, বরকতের জন্যে পয়গম্বরদের নামে নাম রাখা এবং তাঁদের প্রতি সম্বন্ধ করা ঈমানদারদের সাধারণ অভ্যাস। (মুসলিম-তিরমিযী, নাসায়ী।) এই হাদীসের উদ্দেশ্য দু'রকম হতে পারে। (এক) হযরত মারইয়াম হযরত হারূন (আঃ)-এর বংশধর ছিলেন বলেই তাঁর সাথে সম্বন্ধ করা হয়েছে— যদিও তাদের মধ্যে সময়ের অনেক ব্যবধান রয়েছে; যেমন আরবদের রীতি রয়েছে যে, তারা তামীম গোত্রের ব্যক্তিকে اخا تميم এবং আরবের লোককে اخا عرب বলে অভিহিত করে। (দুই) এখানে হারূন বলে মূসা (আঃ)-এর সহচর হারূন নবীকে বোঝানো হয়নি; বরং মারইয়ামের ভ্রাতার নামও ছিল হারূন এবং এ নাম হারূন নবীর নামানুসারে বরকতের জন্য রাখা হয়েছিল। এভাবে মারইয়াম হারূন-ভগিনী বলা সত্যিকার অর্থেই শুদ্ধ।

مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ কোরআনের এই বাক্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ওলী-আল্লাহ্ ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের সন্তান-সন্ততি মন্দ কাজ করলে তাতে সাধারণ লোকদের মন্দ কাজের তুলনায় বেশী গোনাহ্ হয়। কারণ, এতে তাদের বড়দের লাঞ্ছনা ও দুর্নাম হয়। কাজেই বুযুর্গদের সন্তানদের উচিত, সৎকাজ ও আল্লাহ্ভীতিতে অধিক মনোনিবেশ করা।

إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, যে সময় পরিবারের লোকজন মারইয়ামকে ভর্ৎসনা করতে শুরু করে, তখন ঈসা (আঃ) মায়ের বুকের দুধ পান করছিলেন। তিনি তাদের ভর্ৎসনা শুনে স্তন্য ছেড়ে দেন এবং বামদিকে পাশ ফিরে তাদের দিকে মনোযোগ দেন। অতঃপর তর্জনী খাড়া করে বলেন ঃ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ অর্থাৎ, আমি আল্লাহ্র দাস। এই প্রথম বাক্যেই হযরত ঈসা (আঃ) এই ভুল বোঝাবুঝির নিরসন করে দেন যে, যদিও আমি অলৌকিক উপায়ে জন্মগ্রহণ করেছি; কিন্তু আমি আল্লাহ্ নই— আল্লাহ্র দাস। অতএব, কেউ যেন আমার উপাসনায় লিপ্ত না হয়ে পড়ে।

آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا এ বাক্যে হযরত ঈসা (আঃ) তার দুগ্ধ পানের যমানায় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নবুওয়ত ও কিতাব লাভের সংবাদ দিয়েছেন, অথচ কোন পয়গম্বর চল্লিশ বছর বয়সের পূর্বে নবুওয়ত ও কিতাব লাভ করেননি। তাই এর মর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার এটা স্থির সিদ্ধান্ত যে, তিনি যথাসময়ে আমাকে নবুওয়ত ও কিতাব দান করবেন। এটা হুবহু এমন, যেমন মহানবী (সাঃ) বলেছেন ঃ আমাকে নবুওয়ত তখন দান করা হয়েছিল, যখন আদম (আঃ)-এর জন্মই হয়নি — তার খামীর তৈরী হচ্ছিল মাত্র। বলাবাহুল্য, এর উদ্দেশ্য হল এই যে, নবুওয়ত দানের ওয়াদা মহানবী (সাঃ)-এর জন্যে অকাট্য ও নিশ্চিত ছিল। আলোচ্য আয়াতেও এ নিশ্চয়তাকে 'নবী করেছেন' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। নবী করার কথা প্রকাশ করে প্রকারান্তরে তিনি বলেছেন যে, আমার জননীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কেননা, আমার নবী হওয়া এবং রেসালত লাভ করা এ বিষয়েরই প্রমাণ যে,আমার জন্মে কোন গোনাহের দখল থাকতে পারে না।

وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ —তাকিদ সহকারে কোন কাজের নির্দেশ দেয়া হলে তাকে وصيت শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। ঈসা (আঃ) এখানে বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে নামায ও যাকাতের ওসিয়ত করেছেন। তাই এর অর্থ এই যে, খুব তাগিদ সহকারে উভয় কাজের নির্দেশ দিয়েছেন।

নামায ও রোযা হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে শেষনবী (সাঃ) পর্যন্ত প্রত্যেক নবী ও রসূলের শরীয়তেই ফরয রয়েছে। তবে বিভিন্ন শরীয়তে এগুলোর আকার-আকৃতি ও খুঁটিনাটি বিষয়াদি বিভিন্নরূপ ছিল। হযরত ঈসা (আঃ)-এর শরীয়তেও নামায ও যাকাত ফরয ছিল। প্রশ্ন হতে পারে যে, ঈসা (আঃ) কোন সময় মালদার হননি। তিনি গৃহ নির্মাণ করেননি এবং অর্থকড়িও সঞ্চয় করেননি। এমতাবস্থায় তাঁকে যাকাতের আদেশ দেয়ার কি মানে? উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, মালদারের উপর যাকাত ফরয — এটা ছিল তাঁর শরীয়তের আইন। ঈসা (আঃ) ও এই আইনের আওতাভুক্ত ছিলেন যে, কোন সময় নিসাব পরিমাণ মাল একত্রিত হলে তাকেও যাকাত আদায় করতে হবে। অতঃপর যদি সারা জীবন মালই সঞ্চিত না হয়, তবে তা এই আইনের পরিপন্থী নয়।— (রূহুল-মা'আনী)

مَا دُمْتُ حَيًّا অর্থাৎ, নামায ও যাকাতের নির্দেশ আমার জন্যে সর্বকালীন — যে পর্যন্ত জীবিত থাকি। বলাবাহুল্য, এতে পৃথিবীতে অবস্থাকালীন জীবন বোঝানো হয়েছে। কেননা, এসব ক্রিয়াকর্ম এই পৃথিবীতেই হতে পারে এবং পৃথিবীর সাথেই সম্পর্কযুক্ত। আকাশে উঠানোর পর অবতরণের সময় পর্যন্ত অব্যাহতির যমানা।

وَبَرًّا بِوَالِدَتِي এখানে শুধু মাতার কথা বলা হয়েছে, পিতা-মাতার কথা বলা হয়নি। এতে ইঙ্গিত করেছেন যে, আমি অলৌকিকভাবে পিতা ছাড়াই অস্তিত্ব লাভ করেছি। শৈশবের এহেন অলৌকিক কথাবার্তা এর যথেষ্ট সাক্ষ্য ও প্রমাণ।

ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের অলীক চিন্তাধারার মধ্যে বাহুল্য ও স্বল্পতা বিদ্যমান ছিল। খ্রীষ্টানরা তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়ি করে 'খোদার বেটা' বানিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে ইহুদীরা তাঁর অবমাননায় এতটুকু ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে যে, তাঁকে ইউসুফ মিস্ত্রীর জারজ সন্তান বলে আখ্যায়িত করে। (নাউজুবিল্লাহ্) আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে উভয় প্রকার ভ্রান্ত

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ
لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا
يُرْجَعُونَ ﴿٤٠﴾ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا
نَبِيًّا ﴿٤١﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَ
لَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴿٤٢﴾ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ
يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٤٣﴾ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ
إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا ﴿٤٤﴾ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ
يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴿٤٥﴾ قَالَ أَرَاغِبٌ
أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴿٤٦﴾
قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿٤٧﴾ وَ
أَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا
أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿٤٨﴾ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٤٩﴾
وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿٥٠﴾
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٥١﴾

(৩৯) আপনি তাদেরকে পরিতাপের দিবস সম্পর্কে হুশিয়ার করে দিন যখন সব ব্যাপারের মীমাংসা হয়ে যাবে। এখন তারা অনবধানতায় আছে এবং তারা বিশ্বাস স্থাপন করছে না। (৪০) আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী হব পৃথিবীর এবং তার উপর যারা আছে তাদের এবং আমারই কাছে তারা প্রত্যাবর্তিত হবে। (৪১) আপনি এই কিতাবে ইবরাহীমের কথা বর্ণনা করুন। নিশ্চয় তিনি ছিলেন সত্যবাদী, নবী। (৪২) যখন তিনি তার পিতাকে বললেন ঃ হে আমার পিতা, যে শোনে না, দেখে না এবং তোমার কোন উপকারে আসে না, তার এবাদত কেন কর? (৪৩) হে আমার পিতা, আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে; যা তোমার কাছে আসেনি, সুতরাং আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সরল পথ দেখাব। (৪৪) হে আমার পিতা, শয়তানের এবাদত করো না। নিশ্চয় শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য। (৪৫) হে আমার পিতা,আমি আশঙ্কা করি, দয়াময়ের একটি আযাব তোমাকে স্পর্শ করবে, অতঃপর তুমি শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাবে। (৪৬) পিতা বলল ঃ হে ইবরাহীম,তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? যদি তুমি বিরত না হও, আমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণনাশ করব। তুমি চিরতরে আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও। (৪৭) ইবরাহীম বললেন ঃ তোমার উপর শান্তি হোক, আমি আমার পালনকর্তার কাছে তোমার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি মেহেরবান। (৪৮) আমি পরিত্যাগ করছি তোমাদেরকে এবং তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের এবাদত কর তাদেরকে; আমি আমার পালনকর্তার এবাদত করব। আশা করি, আমার পালনকর্তার এবাদত করে আমি বঞ্চিত হব না। (৪৯) অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের এবাদত করত, তাদের সবাইকে পরিত্যাগ করলেন, তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকূব এবং প্রত্যেককে নবী করলাম। (৫০) আমি তাদেরকে দান করলাম আমার অনুগ্রহ এবং তাদেরকে দিলাম সমুচ্চ সুখ্যাতি। (৫১) এই কিতাবে মূসার কথা বর্ণনা করুন, তিনি ছিলেন মনোনীত এবং তিনি ছিলেন রসূল, নবী।

লোকদের ভ্রান্তি বর্ননা করে তাঁর সঠিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। — (কুরতুবী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَوْمَ الْحَسْرَةِ কেয়ামতের দিবসকে পরিতাপের দিবস বলা হয়েছে। কারণ, জাহান্নামীরা সেদিন পরিতাপ করবে যে, তারা ঈমানদার ও সৎকর্মপরায়ণ হলে জান্নাত লাভ করত; কিন্তু এখন তাদের জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে হচ্ছে। পক্ষান্তরে বিশেষ এক প্রকার পরিতাপ জান্নাতীদেরও হবে। হযরত মুআযের রেওয়ায়েতে তাবারানী ও আবু ইয়ালা বর্ণিত হাদীসে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যেসব মুহূর্ত আল্লাহ্র যিকর ছাড়া অতিবাহিত হয়েছে, সেগুলোর জন্যে পরিতাপ করা ছাড়া জান্নাতীদের আর কোন পরিতাপ হবে না। হযরত আবু হুরায়রার (রাঃ) রেওয়ায়েতে বগভী বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিই পরিতাপ ও অনুশোচনা করবে। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন ঃ এই পরিতাপ কিসের কারণে হবে? তিনি বললেন ঃ সৎকর্মশীলদের পরিতাপ হবে এজন্যে যে, তারা আরও বেশী সৎকর্ম কেন করল না, যাতে জান্নাতের আরও উচ্চস্তর অর্জিত হত। পক্ষান্তরে কুকর্মীরা পরিতাপ করবে যে, তারা কুকর্ম থেকে কেন বিরত হল না।

সিদ্দীক কাকে বলে? صِدِّيقًا نَبِيًّا – صديق শব্দটি কোরআনের একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ সংজ্ঞা সম্পর্কে আলেমদের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেউ বলেন ঃ যে ব্যক্তি সারা জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলেননি, তিনি সিদ্দীক। কেউ বলেন ঃ যে ব্যক্তি বিশ্বাস এবং কথা ও কর্মে সত্যবাদী, অর্থাৎ, অন্তরে যেরূপ বিশ্বাস পোষণ করে, মুখে ঠিক তদ্রূপ প্রকাশ করে এবং তার প্রত্যেক কর্ম ও উঠা-বসা এই বিশ্বাসেরই প্রতীক হয়, সে সিদ্দীক। রূহুল মা'আনী, মাযহারী ইত্যাদি গ্রন্থে শেষোক্ত অর্থই অবলম্বণ করা হয়েছে। সিদ্দীকের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। প্রকৃত সিদ্দীক নবী ও রসূলই হতে পারেন এবং প্রত্যেক নবী ও রসূলের জন্যে সিদ্দীক হওয়া একটি অপরিহার্য গুণ। কিন্তু এর বিপরীতে যিনি সিদ্দীক হন, তাঁর জন্যে নবী ও রসূল হওয়া জরুরী নয়; বরং নবী নয় – এমন ব্যক্তি যদি নবী ও রসূলের অনুসরণ করে সিদ্দীকের স্তর অর্জন করতে পারেন, তবে তিনিও সিদ্দীক বলে অভিহিত হবেন; হযরত মারইয়ামকে স্বয়ং কোরআন পাক 'সিদ্দীকা' وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ উপাধি দান করেছে। সাধারণ উম্মতের সংখ্যাধিক্যের মতে তিনি নবী নন এবং কোন নারী নবী হতেও পারেন না।

বড়দেরকে নসিহত করার পন্থা ও আদব ঃ يَا أَبَتِ আরবী অভিধানের দিক দিয়ে এ শব্দটি পিতার জন্যে সম্মান ও ভালবাসাসূচক সম্বোধন। হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্কে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বগুণে গুণান্বিত করেছিলেন। তিনি পিতার সামনে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা মেজাযের সমতা ও বিপরীতমুখী বিষয়বস্তু সন্নিবেশের একটি অনুপম দৃষ্টান্ত। তিনি একদিকে পিতাকে কুফর ও শিরকে শুধু লিপ্তই নয় — এর উদ্যোক্তা রূপেও দেখেন। এই কুফর ও শিরক মিটানোর জন্যেই তিনি সৃজিত হয়েছিলেন। অপরদিকে পিতার আদব, মহত্ত্ব ও ভালবাসা। এ দু'টি বিপরীতমুখী বিষয়কে হযরত খলীলুল্লাহ্ (আঃ) চমৎকারভাবে সমন্বিত করেছেন।

يَا أَبَتِ শব্দটি পিতার দয়া ও ভালবাসার প্রতীক। প্রথমতঃ তিনি

প্রত্যেক বাক্যের শুরুতে এই শব্দ দ্বারা সম্বোধন করেছেন। এরপর কোন বাক্যে এমন কোন শব্দ ব্যবহার করেননি, যা পিতার অবমাননা অথবা মনোকষ্টের কারণ হতে পারত; অর্থাৎ পিতাকে 'কাফের' 'গোমরাহ' ইত্যাদি বলেননি; বরং পয়গম্বরসুলভ প্রজ্ঞার সাথে শুধু তার দেব-দেবীর অক্ষমতা ও অচেতনতা ফুটিয়ে তুলেছেন, যাতে সে নিজেই নিজের ভুল বুঝতে পারে। দ্বিতীয় বাক্যে তিনি আল্লাহ্ প্রদত্ত নবুওয়তের জ্ঞান-গরিমা প্রকাশ করেছেন। তৃতীয় ও চতুর্থ বাক্যে কুফর ও শিরকের সম্ভাব্য অশুভ পরিণতি সম্পর্কে পিতাকে হুশিয়ার করেছেন। এরপরও পিতা চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তে অথবা পুত্রসুলভ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা নম্রতা অবলম্বন করার পরিবর্তে কঠোর ভঙ্গিতে পুত্রকে সম্বোধন করল। হযরত খলীলুল্লাহ্ يَا أَبَتِ বলে, মিষ্ট ভাষায় পিতাকে সম্বোধন করেছিলেন। এর উত্তরে সাধারণের পরিভাষায় يَا بُنَيَّ প্রয়োগ করা সমীচীন ছিল। কিন্তু আযর তাঁর নাম নিয়ে يَا إِبْرَاهِيمُ বলে, সম্বোধন করল। অতঃপর তাঁকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার হুমকি এবং বাড়ী থেকে বের হয়ে যাওয়ার আদেশ জারি করে দিল। এ ক্ষেত্রে হযরত খলীলুল্লাহ্ এর কি জওয়াব দেন, তা শোনা ও স্মরণ রাখার যোগ্য। তিনি বলেন ঃ

سَلَامٌ عَلَيْكَ এখানে سلام শব্দটি দ্বিবিধ অর্থের হতে পারে। (এক) বয়কটের সালাম; অর্থাৎ, কারও সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ভদ্রজনোচিত পন্থা হচ্ছে কথার উত্তর না দিয়ে 'সালাম' বলে পৃথক হয়ে যাওয়া। কোরআন পাক আল্লাহ্র প্রিয় ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের প্রশংসায় বলে ঃ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا অর্থাৎ, মূর্খরা যখন তাদের সাথে মূর্খসুলভ তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাঁরা তাদের মোকাবেলা করার পরিবর্তে সালাম শব্দ বলে দেন। এর উদ্দেশ্য এই যে, বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। (দুই), এখানে প্রচলিত সালামই বোঝানো হয়েছে। এতে আইনগত খটকা এই যে, কোন কাফেরকে প্রথমে সালাম করা হাদীসে নিষিদ্ধ। বোখারী ও মুসলিমে আবু হোরায়রার রেওয়ায়েতে বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ 'খ্রীষ্টান ও ইহুদীদের প্রথমে সালাম করো না।' কিন্তু এর বিপরীতে কোন কোন হাদীসে কাফের, মুশরেক ও মুসলমানদের এক সমাবেশকে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সালাম করেছেন বলে প্রমাণিত রয়েছে। বোখারী ও মুসলিমে হযরত উসামার রেওয়ায়েতে এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي এখানেও উপরোক্ত খটকা বিদ্যমান যে, কোন কাফেরের জন্যে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা শরীয়তের আইনে নিষিদ্ধ ও নাজায়েয। একবার রসূলে করীম (সাঃ) তাঁর চাচা আবু তালেবকে বলেছিলেন ঃ 'আল্লাহ্র কসম, আমি আপনার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমাকে নিষেধ করে দেয়া হয়।' এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হয় ঃ- مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ অর্থাৎ, নবী ও ঈমানদারদের পক্ষে মুশরেকদের জন্যে ইস্তেগফার করা বৈধ নয়। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) চাচার জন্যে ইস্তেগফার ত্যাগ করেন।

খটকার জওয়াব এই যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পিতার সাথে ওয়াদা করা যে, আপনার জন্যে ইস্তেগফার করব— এটা নিষেধাজ্ঞার পূর্বেকার ঘটনা। নিষেধ পরে করা হয়।

وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي একদিকে তো হযরত খলীলুল্লাহ্ (আঃ) পিতার আদব ও মহব্বতের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে; অপরদিকে সত্য-প্রকাশ ও সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠাকে এতটুকুও কলঙ্কিত হতে দেননি। বাড়ী থেকে বের হয়ে যাওয়ার যে আদেশ পিতা দিয়েছিল, আলোচ্য বাক্যে তা তিনি সানন্দে শিরোধার্য করে নেন এবং সাথে সাথে একথাও বলে দেন যে, আমি তোমার দেব-দেবীকে ঘৃণা করি এবং শুধু আমার পালনকর্তার এবাদত করি।

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

পূর্ববর্তী বাক্যে ইবরাহীম (আঃ)-এর উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, আমি আশা করি, আমার পালনকর্তার কাছে দোয়া করে আমি বঞ্চিত ও বিফল মনোরথ হব না। বাহ্যতঃ এখানে গৃহ ও পরিবারবর্গ ত্যাগ করার পর নিঃসঙ্গতার আতঙ্ক ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষার দোয়া বোঝানো হয়েছিল। আলোচ্য বাক্যে এই দোয়া কবুল করার কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম (আঃ) যখন আল্লাহ্র জন্যে নিজ গৃহ, পরিবারবর্গ ও তাদের দেব-দেবীকে বিসর্জন দিলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এই ক্ষতিপূরণার্থে তাঁকে পুত্র ইসহাক দান করলেন। এই পুত্র যে দীর্ঘায়ু ও সন্তানের পিতা হয়েছিলেন, তাও 'ইয়াকুব' (পৌত্র) শব্দ যোগ করে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। পুত্র দান থেকে বোঝা যায় যে, ইতিপূর্বে ইবরাহীম (আঃ) বিবাহ করেছিলেন। কাজেই আয়াতের সারমর্ম এই দাঁড়াল যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে পিতার পরিবারের চাইতে উত্তম একটি স্বতন্ত্র পরিবার দান করলেন, যা পয়গম্বর ও সৎকর্মপরায়ণ মহাপুরুষদের সমন্বয়ে গঠিত ছিল।

كَانَ مُخْلَصًا আল্লাহ্ তা'আলা যে ব্যক্তিকে নিজের জন্যে খাঁটি করে নেন, অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কোন কিছুর দিকে ভ্রূক্ষেপ করে না এবং নিজের সমস্ত কামনা-বাসনাকে আল্লাহ্র জন্যে নিবেদিত করে দেয়, তাকে مخلص বলা হয়। পয়গম্বরগণই বিশেষভাবে এ গুণে গুণান্বিত হন; যেমন—কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ অর্থাৎ আমি পয়গম্বরদেরকে পরকাল স্মরণ করার কাজের জন্যে বিশেষভাবে নিয়োজিত করেছি। উম্মতের মধ্যে যেসব কামেল পুরুষ পয়গম্বরদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তারাও আংশিকভাবে এই মর্তবা লাভ করেন। এর আলামত এই যে, তাঁদেরকে গোনাহ্ ও মন্দ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখা হয় এবং তাঁরা আল্লাহ্র হেফাযতে থাকেন।

وَنَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا ﴿٥٢﴾ وَ
وَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَّحْمَتِنَآ اَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا ﴿٥٣﴾ وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ
اِسْمٰعِيْلَ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ﴿٥٤﴾ وَ
كَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾
وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ﴿٥٦﴾ وَّرَفَعْنٰهُ
مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٧﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ
مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ وَّمِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ
وَاِسْرَآءِيْلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ
الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا ﴿٥٨﴾ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ
اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾
اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا ﴿٦٠﴾ جَنّٰتِ عَدْنِ ِالَّتِيْ وَعَدَ
الرَّحْمٰنُ عِبَادَهٗ بِالْغَيْبِ اِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهٗ مَاْتِيًّا ﴿٦١﴾ لَا يَسْمَعُوْنَ
فِيْهَا لَغْوًا اِلَّا سَلٰمًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ﴿٦٢﴾
تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿٦٣﴾

(৫২) আমি তাকে আহবান করলাম তূর পাহাড়ের ডান দিক থেকে এবং গূঢ়তত্ত্ব আলোচনার উদ্দেশে তাকে নিকটবর্তী করলাম। (৫৩) আমি নিজ অনুগ্রহে তাঁকে দান করলাম তাঁর ভাই হারূনকে নবীরূপে। (৫৪) এই কিতাবে ইসমাঈলের কথা বর্ণনা করুন, তিনি প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং তিনি ছিলেন রসূল,নবী। (৫৫) তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে নামায ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি তার পালনকর্তার কাছে পছন্দনীয় ছিলেন। (৫৬) এই কিতাবে ইদরীসের কথা আলোচনা করুন, তিনি ছিলেন সত্যবাদী, নবী। (৫৭) আমি তাকে উচ্চে উন্নীত করেছিলাম। (৫৮) এরাই তারা–নবীগণের মধ্য থেকে যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা নেয়ামত দান করেছেন। এরা আদমের বংশধর এবং যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম, তাদের বংশধর এবং ইবরাহীম ও ইসরাঈলের বংশধর এবং যাদেরকে আমি পথ প্রদর্শন করেছি ও মনোনীত করেছি, তাদের বংশোদ্ভূত। তাদের কাছে যখন দয়াময় আল্লাহ্র আয়াতসমূহ পাঠ করা হত, তখন তারা সেজদায় লুটিয়ে পড়ত এবং ক্রন্দন করত। (৫৯) অতঃপর তাদের পরে এল অপদার্থ পরবর্তীরা। তারা নামায নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হল। সুতরাং তারা অচিরেই পথভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ করবে। (৬০) কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা তওবা করেছে, বিশ্বাস স্থাপন করেছে। সুতরাং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের উপর কোন জুলুম করা হবে না। (৬১) তাদের স্থায়ী বসবাস হবে যার ওয়াদা দয়াময় আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে অদৃশ্যভাবে দিয়েছেন। অবশ্যই তাঁর ওয়াদায় তারা পৌঁছবে। (৬২) তারা সেখানে সালাম ব্যতীত কোন অসার কথাবার্তা শুনবে না এবং সেখানে সকাল – সন্ধ্যা তাদের জন্যে রুযী থাকবে। (৬৩) এটা ঐ জান্নাত যার অধিকারী করব আমার বান্দাদের মধ্যে পরহেযগারদেরকে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ এই সুপ্রসিদ্ধ পাহাড়টি সিরিয়ায় মিসর ও মাদইয়ানের মধ্যস্থলে অবস্থিত। বর্তমানেও পাহাড়টি এ নামেই প্রসিদ্ধ। আল্লাহ্ তা'আলা একেও অনেক বিষয়ে বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন।

الْاَيْمَنِ তূর পাহাড়ের ডানদিকে হযরত মূসা (আঃ)–এর দিক দিয়ে বলা হয়েছে। কেননা, তিনি মাদইয়্যান থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন। তূর পর্বতের বিপরীত দিকে পৌঁছার পর তূর পাহাড় তাঁর ডান দিকে ছিল।

نَجِيًّا কানাকানি ও বিশেষ কথাবার্তাকে مناجات এবং যার সাথে এরূপ কথাবার্তা বলা হয়, তাকে نجى বলা হয়।

وَوَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَّحْمَتِنَآ اَخَاهُ هٰرُوْنَ শব্দের অর্থ দান। হযরত মূসা (আঃ) দোয়া করেছিলেন যে, তাঁর সাহায্যের জন্যে হারূনকেও নবী করা হোক। এই দোয়া কবুল করা হয়। আয়াতে وهبنا বলে তাই ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, আমি মূসাকে 'হারূন' দান করেছি। এ কারণেই হযরত হারূন (আঃ)–কে هبة الله (আল্লাহ্র দান)–ও বলা হয়।— (মাযহারী)

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ বাহ্যতঃ এখানে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম (আঃ)–কেই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু তাঁর পিতা ইবরাহীম ও ভ্রাতা ইসহাকের সাথে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়নি ; বরং মাঝখানে হযরত মূসার কথা উল্লেখ করার পর তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবতঃ বিশেষ গুরুত্ব সহকারে তাঁর কথা উল্লেখ করাই এর উদ্দেশ্য। তাই আনুষঙ্গিকভাবে উল্লেখ না করে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে প্রেরণকালের ক্রম অনুসারে পয়গম্বরদের উল্লেখ করা হয়নি। কেননা, হযরত ইদরীস (আঃ) –এর কথা সবার শেষে উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ সময়কালের দিক দিয়ে তিনি সবার অগ্রে।

كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ ওয়াদা পূরণ করা একটি চারিত্রিক গুণ। প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি একে জরুরী মনে করে। এর বিপরীত করাকে হীন কাজ বলে বিবেচনা করা হয়। হাদীসে ওয়াদা ভঙ্গ করাকে মুনাফেকীর লক্ষণ বলা হয়েছে। এ জন্যেই আল্লাহ্র প্রত্যেক নবী ও রসূলই ওয়াদা পালনে সাচ্চা; কিন্তু এই বর্ণনা পরম্পরায় বিশেষ বিশেষ পয়গম্বরের সাথে বিশেষ বিশেষ গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এরূপ নয় যে, এই গুণ অন্যদের মধ্যে বিদ্যমান নেই; বরং এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, তাঁর মধ্যে এই গুণটি একটি স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে বিদ্যমান আছে। উদাহরণতঃ এইমাত্র হযরত মূসা (আঃ)–এর আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর মনোনীত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে; অথচ এ গুণটিও সব পয়গম্বরের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে হযরত মূসা (আঃ) বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী ছিলেন, তাই তাঁর আলোচনায় এর উল্লেখ করা হয়েছে।

ওয়াদা পালনে হযরত ইসমাঈল (আঃ)–এর স্বাতন্ত্র্যের কারণ এই যে, তিনি আল্লাহ্র সাথে কিংবা কোন বান্দার সাথে যে বিষয়ের ওয়াদা করেছেন, অবিচল নিষ্ঠা ও যত্ন সহকারে তা পালন করেছেন। তিনি আল্লাহ্র সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, নিজেকে জবাই এর জন্যে পেশ করে দেবেন এবং তজ্জন্যে সবর করবেন। তিনি এ ওয়াদায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। একবার তিনি জনৈক ব্যক্তির সাথে একস্থানে সাক্ষাতের ওয়াদা করেছিলেন; কিন্তু লোকটি সময়মত আগমন না করায় তিনি সেখানে তিন

দিন এবং কোন কোন রেওয়ায়েত মতে এক বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকেন। (মাযহারী) আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই-এর রেওয়ায়েতে তিরমিযীতে মহানবী (সাঃ) প্রসঙ্গেও ওয়াদা করে সেস্থানে তিন দিন অপেক্ষা করার ঘটনা বর্ণিত আছে।—(কুরতুবী)

ওয়াদাপূরণ করার গুরুত্ব ও মর্তবা ঃ ওয়াদা পূরণ করা সকল পয়গম্বর ও সৎকর্মপরায়ণ মনীষীদের বিশেষ গুণ এবং সম্ভ্রান্ত লোকদের অভ্যাস। এর বিপরীত করা পাপাচারী ও হীন লোকদের চরিত্র। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ الوعد دين ওয়াদা একটি ঋণ। অর্থাৎ,ঋণ পরিশোধ করা যেমন অপরিহার্য, তেমনি ওয়াদা পূরণে যত্নবান হওয়াও জরুরী। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ মুমিনের ওয়াদা ওয়াজিব।

ফেকাহ্‌বিদগণ বলেছেন ঃ ওয়াদার ঋণ হওয়া এবং ওয়াজিব হওয়ার অর্থ এই যে, শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতীত ওয়াদা পূরণ না করা গোনাহ্। কিন্তু ওয়াদা এমন ঋণ নয় যে, তজ্জন্যে আদালতের শরণাপন্ন হওয়া যায় কিংবা জবরদস্তি আদায় করা যায়। ফেকাহ্‌বিদদের পরিভাষায় একে বলা হয় ধর্মতঃ ওয়াজিব— বিচারে ওয়াজিব নয়।— (কুরতুবী)

পরিবার-পরিজন থেকে সংস্কার কাজ শুরু করা সংস্কারকের অবশ্য কর্তব্য ঃ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর আরও একটি বিশেষ গুণ এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি নিজ পরিবার পরিজনকে নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিতেন। এখানে প্রশ্ন হলো যে, পরিবার-পরিজনকে সৎকাজের নির্দেশ দেয়া তো প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের দায়িত্বে ওয়াজিব। কোরআন পাকে সাধারণ মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে ঃ قُوْٓا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا অর্থাৎ, নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারবর্গকে অগ্নি থেকে রক্ষা কর। সুতরাং এ ব্যাপারে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্য কি? জওয়াব এই যে, বিষয়টি যদিও ব্যাপকভাবে সব মুসলমানের করণীয়; কিন্তু হযরত ইসমাঈল (আঃ) এ কাজের জন্যে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে ও সর্বপ্রযত্নে চেষ্টিত ছিলেন ; যেমন—মহানবী (সাঃ) - এর প্রতিও বিশেষ নির্দেশ ছিল যে, وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ অর্থাৎ, গোত্রের নিকটতম আত্মীয়দেরকে আল্লাহ্‌র আযাব সম্পর্কে সতর্ক করুন। এ নির্দেশ পালনার্থে তিনি পরিবারবর্গকে একত্রিত করে বিশেষ ভাষণ দেন।

এখানে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, পয়গম্বরগণ সবাই সমগ্র জাতির হেদায়েতের জন্যে প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁরা সবাইকে সত্যের পয়গাম পৌছিয়েছেন, খোদায়ী নির্দেশের অনুগামী করেছেন। আয়াতে বিশেষভাবে পরিবারবর্গের কথা উল্লেখ করার কারণ কি? জওয়াব এই যে, পয়গম্বরগণের দাওয়াতের বিশেষ কতিপয় মূলনীতি আছে। তমধ্যে একটি এই যে, হেদায়েতের কাজ সর্বপ্রথম নিজ গৃহ থেকে শুরু করতে হবে। নিজ পরিবারের লোকজনের পক্ষে হেদায়েত মেনে নেয়া এবং মানানো অপেক্ষাকৃত সহজও। তাদের দেখাশোনাও সদাসর্বদা করা যায়। তারা যখন কোন বিশেষ রঙে রঞ্জিত হয়ে পাকাপোক্ত হয়ে যায়, তখন একটি ধর্মীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে ব্যাপক দাওয়াত ও অন্যদের সংশোধনে বিরাট সহায়তা করে। মানবজাতির সংশোধনের সর্বাধিক কার্যকরী পন্থা হচ্ছে, একটি বিশুদ্ধ ধর্মীয় পরিবেশ অস্তিত্বে আনয়ন করা। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, প্রত্যেক ভাল অথবা মন্দ বিষয় শিক্ষা-দীক্ষা ও উপদেশের চাইতে পরিবেশের মাধ্যমেই অধিক প্রসার লাভ করে।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ إِدْرِيسَ হযরত ইদরীস (আঃ) নূহ (আঃ)-এর এক হাজার বছর পূর্বে তাঁর পিতৃপুরুষদের অন্যতম ছিলেন। (মুস্তাদরাক হাকিম) হযরত আদম (আঃ)- এর পর তিনিই সর্বপ্রথম নবী ও রসূল, যার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা ত্রিশটি সহীফা নাযিল করেন। (হামাখশারী) হযরত ইদরীস (আঃ) সর্বপ্রথম মানব, যাকে মু'জেযা হিসেবে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অংকবিজ্ঞান দান করা হয়েছিল। (বাহ্‌রে মুহীত) তিনিই সর্বপ্রথম মানব, যিনি কলমের সাহায্যে লেখা ও বস্ত্র সেলাই আবিষ্কার করেন। তাঁর পূর্বে মানুষ সাধারণতঃ পোশাকের স্থলে জীবজন্তুর চামড়া ব্যবহার করত। ওজন ও পরিমাপের পদ্ধতিও সর্বপ্রথম তিনিই আবিষ্কার করেন এবং অস্ত্র-শস্ত্রের আবিষ্কারও তাঁর আমল থেকেই শুরু হয়। তিনি অস্ত্র নির্মাণ করে কাবিল গোত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ করেন। (বাহ্‌রে মুহীত, কুরতুবী, মাযহারী, রূহুল মা'আনী)

وَرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا অর্থাৎ, আমি ইদরীস (আঃ)-কে উচ্চ মর্তবায় সমুন্নত করেছি। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁকে নবুওয়ত, রেসালত ও নৈকট্যের বিশেষ মর্তবা দান করা হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, ইদরীস (আঃ)-কে আকাশে তুলে নেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে ইবনে কাসীর বলেন ঃ

অর্থাৎ, এটা কা'বে আহ্‌বারের ইসরাঈলী রেওয়ায়েত। এর কোন কোনটি বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা স্বীকৃত নয়। কোরআন পাকের আলোচ্য বাক্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় না যে, এখানে মর্তবা উচ্চ করা বোঝানো হয়েছে, না জীবিত অবস্থায় তাকে আকাশে তুলে নেয়া বোঝানো হয়েছে। কাজেই আকাশে তুলে নেয়ার বিষয়টির অস্বীকৃতি অকাট্য নয়। কোরআনের তফসীর এর উপর নির্ভরশীল নয়। (বয়ানুল -কোরআন)

রসূল ও নবীর সংজ্ঞায় পার্থক্য ও উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক ঃ বয়ানুল -কোরআন থেকে উদ্ধৃতি ঃ রসূল ও নবীর সংজ্ঞায় বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। বিভিন্ন আয়াত নিয়ে চিন্তা-ভাবনার পর আমার কাছে যে বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে, তা এই যে, যিনি উম্মতের কাছে নতুন শরীয়ত প্রচার করেন, তিনি রসূল। এখন শরীয়তটি স্বয়ং রসূলের দিক দিয়ে নতুন হোক, যেমন— তওরাত ইত্যাদি কিংবা শুধু উম্মতের দিক দিয়েই নতুন হোক, যেমন ইসমাঈল (আঃ)-এর শরীয়ত; এটা প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রাচীন শরীয়তই ছিল, কিন্তু যে জুরহাম গোত্রের প্রতি তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন, তারা পূর্বে এ শরীয়ত সম্পর্কে কিছুই জানত না। হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে তারা এ শরীয়ত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। এ অর্থের দিক দিয়ে রসূলের জন্য নবী হওয়া জরুরী নয়; যেমন—ফেরেশতা রসূল, কিন্তু নবী নন। অথবা যেমন— ঈসা (আঃ -এর প্রেরিত দূত। আয়াতে তাদেরকে إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ বলা হয়েছে, অথচ তারা নবী ছিলেন না।

যার কাছে ওহী আগমন করে, তিনি নবী; তিনি নতুন শরীয়ত প্রচার করুন কিংবা প্রাচীন শরীয়ত। উদাহরণতঃ বনী-ইসরাঈলের অধিকাংশ নবী মূসা (আঃ)-এর শরীয়ত প্রচার করতো। এ থেকে জানা গেল যে, একদিক দিয়ে রসূল শব্দটি নবী শব্দের চাইতে ব্যাপক এবং অন্য দিক দিয়ে নবী শব্দটি রসূল শব্দের চাইতে ব্যাপক। যে আয়াতে উভয় শব্দ এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন উল্লেখিত আয়াতসমূহে رَسُولًا نَبِيًّا বলা হয়েছে, সেখানে কোন খটকা নেই। কেননা, বিশেষ ও ব্যাপকের একত্র সমাবেশ

অযৌক্তিক নয়; কিন্তু যেখানে উভয় শব্দ পরস্পর বিপরীতমুখী হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ বাক্যে বলা হয়েছে, সেখানে স্থানের ইঙ্গিতে নবীর অর্থ হবে এমন ব্যক্তি, যিনি পূর্ববর্তী শরীয়ত প্রচার করেন।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ এখানে শুধু হযরত ইদরীস (আঃ)-কে বোঝানো হয়েছে, وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ এখানে শুধু হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে বোঝানো হয়েছে, وَّمِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ এখানে ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকুব (আঃ)-কে বোঝানো হয়েছে এবং وَاِسْرَآءِيْلَ এখানে হযরত মূসা, হারূন, যাকারিয়া ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা (আঃ)-কে বোঝানো হয়েছে।

اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কয়েকজন প্রধান পয়গম্বরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করে তাঁদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। পয়গম্বরদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জনসাধারণের পক্ষ থেকে বাড়াবাড়ির আশঙ্কা ছিল; যেমন ইহুদীরা হযরত ওযায়রকে এবং খ্রীষ্টানরা হযরত ঈসাকে খোদাই বানিয়ে দিয়েছে, তাই এই সমষ্টির পর তারা যে আল্লাহ্র সামনে সেজদাকারী এবং আল্লাহ্র ভয়ে ভীত ছিলেন, একথা আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে, যাতে সম্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়িও না হয় এবং অবমাননাও না হয়।— (বয়ানুল-কোরআন)

কোরআন তেলাওয়াতের সময় কান্না অর্থাৎ অশ্রুসজল হওয়া পয়গম্বরদের সুন্নতঃ এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, কোরআনের আয়াত তেলাওয়াতের সময় কান্নার অবস্থা সৃষ্টি হওয়া প্রশংসনীয় এবং পয়গম্বরদের সুন্নত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ), সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও ওলী-আল্লাহ্দের থেকে এ ধরনের বহু ঘটনা বর্ণিত আছে।

কুরতুবী বলেন ঃ কোরআন পাকে সেজদার যে আয়াত তেলাওয়াত করা হয়, তার সাথে মিল রেখে সেজদায় দোয়া করা আলেমদের মতে মুস্তাহাব। উদাহরণতঃ সূরা সেজদায় এই দোয়া করা উচিত ঃ

اللّٰهم اجعلنى من الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك

واعوذبك ان اكون من المستكبرين عن امرك

خلف লামের সাকিন যোগে এ শব্দটির অর্থ মন্দ উত্তরসূরী, মন্দ সন্তান-সন্ততি এবং লামের যবর যোগে এর অর্থ হয় উত্তম উত্তরসূরী এবং উত্তম সন্তান-সন্ততি। (মাযহারী) মুজাহিদ বলেন ঃ কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে যখন সৎকর্মপরায়ণ লোকদের অস্তিত্ব থাকবে না, তখন এরূপ ঘটনা ঘটবে। তখন নামাযের প্রতি কেউ ভ্রূক্ষেপ করবে না এবং প্রকাশ্যে পাপাচার অনুষ্ঠিত হবে।

নামায অসময়ে অথবা জমাআত ছাড়া পড়া নামায নষ্ট করার শামিল এবং বড় গোনাহ্ ঃ আয়াতে 'নামায নষ্ট করা' বলে আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, নখয়ী, কাসেম, মুজাহিদ, ইবরাহীম, ওমর ইবনে আবদুল আযীয প্রমুখ বিশিষ্ট তফসীরবিদদের মতে, অসময়ে নামায পড়া বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন ঃ সময়সহ নামাযের আদব ও শর্তসমূহের মধ্যে কোনটিতে ত্রুটি করা নামায নষ্ট করার শামিল, আবার কারও কারও মতে 'নামায নষ্ট করা। বলে জমাআত ছাড়া নিজ গৃহে নামায পড়া বোঝানো হয়েছে।— (কুরতুবী, বাহ্রে মুহীত)

খলীফা হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) সকল সরকারী কর্মচারীদের কাছে এই নির্দেশনামা লিখে প্রেরণ করেছিলেন ঃ 'আমার কাছে তোমাদের সব কাজের মধ্যে নামায সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। অতএব যে ব্যক্তি নামায নষ্ট করে, সে দ্বীনের অন্যান্য বিধি-বিধান আরাও বেশী নষ্ট করবে।— (মুয়াত্তা মালেক)

হযরত হুযায়ফা (রাঃ) এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে নামাযের আদব ও রোকন ঠিকমত পালন করছেন না। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কবে থেকে এভাবে নামায পড়ছ? লোকটি বলল ঃ চল্লিশ বছর ধরে। হুযায়ফা বললেন ঃ তুমি একটি নামাযও পড়নি। যদি এ ধরনের নামায পড়েই তুমি মারা যাও, তবে মনে রেখো— মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আনীত আদর্শের বিপরীতে তোমার মৃত্যু হবে।

তিরমীযিতে হযরত আবু মাসউদ আনসারীর বাচনিক বর্ণিত হাদীসে রসূল করীম (সাঃ) বলেন ঃ ঐ ব্যক্তির নামায হয় না, যে নামাযে 'একামত' করে না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি রুকূ ও সেজদায়, রুকূ থেকে দাঁড়িয়ে অথবা দুই সেজদার মধ্যস্থলে সোজা দাঁড়ানো অথবা সোজা হয়ে বসাকে গুরুত্ব দেয় না, তার নামায হয় না।

وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ - شهوات (কুপ্রবৃত্তি) বলে দুনিয়ার সেসব আকর্ষণকে বোঝানো হয়েছে, যেগুলো মানুষকে আল্লাহ্র স্মরণ ও নামায থেকে গাফেল করে দেয়। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ বিলাসবহুল গৃহ নির্মাণ, পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণকারী যানবাহনে আরোহণ এবং সাধারণ লোকদের থেকে স্বাতন্ত্র্যমূলক পোশাক আয়াতে উল্লেখিত কুপ্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত।— (কুরতুবী)

فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا আরবী ভাষায় غى শব্দটি رشاد এর বিপরীত। প্রত্যেক কল্যাণকর বিষয়কে رشاد এবং প্রত্যেক অনিষ্টকর বিষয়কে غى বলা হয়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেন ঃ 'গাই' জাহান্নামের একটি গর্তের নাম। এতে সমগ্র জাহান্নামের চাইতে অধিক আযাবের সমাবেশ রয়েছে।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'গাই' জাহান্নামের একটি গুহার নাম। জাহান্নামও এর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ তাআলা যাদের জন্যে এই গুহা প্রস্তুত করেছেন তারা হচ্ছে, যে যিনাকার যিনায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, যে মদ্যপায়ী মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, যে সুদখোর সুদগ্রহণ থেকে বিরত হয় না, যারা পিতা-মাতার অবাধ্যতা করে, যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় এবং যে নারী অপরের সন্তানকে তার স্বামীর সন্তানে পরিণত করে।— (কুরতুবী)

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا - لغو বলে অনর্থক ও অসার কথাবার্তা,

وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۖ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا
وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَ
الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ۚ هَلْ تَعْلَمُ
لَهُ سَمِيًّا ﴿٦٥﴾ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿٦٦﴾
أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴿٦٧﴾
فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ
جِثِيًّا ﴿٦٨﴾ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ
عِتِيًّا ﴿٦٩﴾ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ﴿٧٠﴾ وَإِن
مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٧١﴾ ثُمَّ نُنَجِّي
الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ
آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ
خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٣﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ
أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا ﴿٧٤﴾ قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ
الرَّحْمَٰنُ مَدًّا ۚ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا
السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿٧٥﴾

(৬৪) (জিবরাঈল বলল ঃ) আমি আপনার পালনকর্তার আদেশ ব্যতীত অবতরণ করি না, যা আমাদের সামনে আছে, যা আমাদের পশ্চাতে আছে এবং যা এ দুই-এর মধ্যস্থলে আছে, সবই তাঁর এবং আপনার পালনকর্তা বিস্মৃত হওয়ার নন। (৬৫) তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবার পালনকর্তা। সুতরাং তাঁরই বন্দেগী করুন এবং তাতে দৃঢ় থাকুন। আপনি কি তাঁর সমনাম কাউকে জানেন? (৬৬) মানুষ বলে ঃ আমার মৃত্যু হলে পর আমি কি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হব? (৬৭) মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাকে ইতিপূর্বে সৃষ্টি করেছি এবং সে তখন কিছুই ছিল না। (৬৮) সুতরাং আপনার পালনকর্তার কসম, আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং শয়তানদেরকে একত্রে সমবেত করব, অতঃপর অবশ্যই তাদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চারপাশে উপস্থিত করব। (৬৯) অতঃপর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দয়াময় আল্লাহ্‌র সর্বাধিক অবাধ্য, আমি অবশ্যই তাকে পৃথক করে নেব। (৭০) অতঃপর তাদের মধ্যে যারা জাহান্নামে প্রবেশের অধিক যোগ্য, আমি তাদের বিষয়ে ভালোভাবে জ্ঞাত আছি। (৭১) তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তথায় পৌঁছবে না। এটা আপনার পালনকর্তার অনিবার্য ফয়সালা। (৭২) অতঃপর আমি পরহেযগারদেরকে উদ্ধার করব এবং জালেমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব। (৭৩) যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয়, তখন কাফেররা মুমিনদেরকে বলে ঃ দুই দলের মধ্যে কোন্‌টি মর্তবায় শ্রেষ্ঠ এবং কার মজলিস উত্তম? (৭৪) তাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে আমি বিনাশ করেছি, তারা তাদের চাইতে সম্পদে ও জাঁক-জমকে শ্রেষ্ঠ ছিল। (৭৫) বলুন, যারা পথভ্রষ্টতায় আছে, দয়াময় আল্লাহ্ তাদেরকে যথেষ্ট অবকাশ দেবেন; এমনকি অবশেষে তারা প্রত্যক্ষ করবে যে বিষয়ে তাদেরকে ওয়াদা দেয়া হচ্ছে, তা আযাব হোক অথবা কেয়ামতই হোক। সুতরাং তখন তারা জানতে পারবে কে মর্তবায় নিকৃষ্ট ও দলবলে দুর্বল।

গালিগালাজ এবং পীড়াদায়ক বাক্যালাপ বোঝানো হয়েছে। জান্নাতবাসিগণ এ থেকে পবিত্র থাকবে। কোনরূপ কষ্টদায়ক কথা তাদের কানে ধ্বনিত হবে না।

إِلَّا سَلَامًا এটা পূর্ববাক্যের ব্যতিক্রম। উদ্দেশ্য এই যে, সেখানে যার যে কথা শোনা যাবে, তা শান্তি, নিরাপত্তা ও আনন্দ বৃদ্ধি করবে। পারিভাষিক সালামও এর অন্তর্ভুক্ত। জান্নাতিগণ একে অপরকে সালাম করবে এবং আল্লাহ্‌র ফেরেশতাগণ তাদের সবাইকে সালাম করবে।— (কুরতুবী)

وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا জান্নাতে সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত এবং দিন ও রাত্রির অস্তিত্ব থাকবে না। সদা-সর্বদা একই প্রকার আলো থাকবে। কিন্তু বিশেষ পদ্ধতিতে দিন, রাত্রি ও সকাল-সন্ধ্যার পার্থক্য সূচিত হবে। এই রকম সকাল-সন্ধ্যায় জান্নাতবাসীরা তাদের জীবনোপকরণ লাভ করবে। একথা সুস্পষ্ট যে, জান্নাতিগণ যখন যে বস্তু কামনা করবে, তখনই কালবিলম্ব না করে তা পেশ করা হবে।

এমতাবস্থায় মানুষের অভ্যাস ও স্বভাবের ভিত্তিতে সকাল-সন্ধ্যার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষ সকাল-সন্ধ্যায় আহারে অভ্যস্ত। আরবরা বলে ঃ যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যার পূর্ণ আহার্য যোগাড় করতে পারে, সে সুখী ও স্বাচ্ছন্দ শীল।

হযরত আনাস ইবনে মালেক এই আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন ঃ এ থেকে বোঝা যায় যে, মুমিনদের আহার দিনে দু'বার হয়—সকাল ও সন্ধ্যায়।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ আয়াতে সকাল-সন্ধ্যা বলে ব্যাপক সময় বোঝানো হয়েছে, যেমন দিবারাত্রি ও পূর্ব-পশ্চিম শব্দগুলোও ব্যাপক অর্থে বলা হয়ে থাকে। কাজেই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতীদের খায়েশ অনুযায়ী তাদের খাদ্য সর্দাসর্বদা উপস্থিত থাকবে।— (কুরতুবী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ — اصطبار শব্দের অর্থ পরিশ্রম ও কষ্টের কাজে দৃঢ় থাকা। ইঙ্গিত রয়েছে যে, এবাদতের স্থায়িত্ব পরিশ্রমসাপেক্ষ। এবাদতকারীর এ জন্যে প্রস্তুত থাকা উচিত।

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ সম্মান। এটা আশ্চর্যের বিষয় বটে, মুশরিক ও প্রতিমা পূজারীরা যদিও এবাদতে আল্লাহ্ তাআলার সাথে অনেক মানুষ, ফেরেশতা, পাথর ও প্রতিমাকে অংশীদার করেছিল এবং তাদেরকে 'ইলাহ্' তথা উপাস্য বলত; কিন্তু কেউ কোনদিন কোন মিথ্যা উপাস্যের নাম আল্লাহ্ রাখেনি। সৃষ্টিগত ও নিয়ন্ত্রণগত ব্যবস্থাধীনেই দুনিয়াতে কোন মিথ্যা উপাস্য আল্লাহ্ নামে অভিহিত হয়নি। তাই এই প্রসিদ্ধ অর্থের দিক দিয়েও আয়াতের বিষয়বস্তু সুস্পষ্ট যে, দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র কোন সমনাম নেই।

মুজাহিদ, ইবনে জুবায়ের, কাতাদাহ্, ইবনে আব্বাস প্রমুখ অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকে এস্থলে سمی শব্দের অর্থ অনুরূপ সদৃশ বর্ণিত রয়েছে। এর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, পূর্ণতার গুণাবলীতে আল্লাহ্ তাআলার কোন সমতুল্য, সমকক্ষ নেই।

لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ এখানে والشياطين এর واو

مع (সহ) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক কাফেরকে তার শয়তানসহ একই শিকলে বেঁধে উত্থিত করা হবে। এমতাবস্থায় এ বর্ণনাটি হবে শুধু কাফেরদেরকে সমবেত করা সম্পর্কে। পক্ষান্তরে যদি মুমিন ও কাফের ব্যাপক অর্থে নেয়া হয়, তবে শয়তানদের সাথে তাদের সবাইকে সমবেত করার মর্মার্থ হবে এই যে, প্রত্যেক কাফের তো তার শয়তানের সাথে বাঁধা অবস্থায় উপস্থিত হবেই এবং মুমিনগণও এই মাঠে আলাদা থাকবে না; ফলে সবার সাথে শয়তানদের সহঅবস্থান হবে।— (কুরতুবী)

حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا হাশরের প্রাথমিক অবস্থায় মুমিন, কাফের, ভাগ্যবান ও হতভাগা সবাইকে জাহান্নামের চারদিকে সমবেত করা হবে। সবাই ভীতিবিহ্বল নতজানু অবস্থায় পড়ে থাকবে। এরপর মুমিন ও ভাগ্যবানদেরকে জাহান্নাম অতিক্রম করিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। ফলে জাহান্নামের ভয়াবহ দৃশ্য দেখার পর তারা পুরোপুরি খুশী, ধর্মদ্রোহীদের দুঃখে আনন্দ এবং জান্নাতলাভের কারণে অধিকতর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ – شيعة শব্দের আসল অর্থ কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা বিশেষ মতবাদের অনুসারী। তাই সম্প্রদায় অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কাফেরদের বিভিন্ন দলের মধ্যে যে দলটি সর্বাধিক উদ্ধত হবে, তাকে সবার মধ্য থেকে পৃথক করে অগ্রে প্রেরণ করা হবে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ অপরাধের আধিক্যের ক্রমানুসারে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে অপরাধীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে।— (মাযহারী)

وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا অর্থাৎ, জাহান্নামে পৌঁছবে না, এমন কোন মুমিন ও কাফের থাকবে না। এখানে পৌঁছার অর্থ প্রবেশ নয়—অতিক্রম করা। হযরতই ইবনে মাসউদের এক রেওয়ায়েতে مرور (অতিক্রম করা) শব্দও বর্ণিত রয়েছে। যদিও প্রবেশ অর্থ নেয়া হয়, তবে মুমিন ও পরহেযগারদের প্রবেশ এভাবে হবে যে, জাহান্নাম তদের জন্যে শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যাবে, তারা কোনরূপ কষ্ট অনুভব করবে না। হযরত আবু সুমাইয়ার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কোন সৎ ও পাপাচারী ব্যক্তি প্রথমাবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ থেকে বাদ পড়বে না। কিন্তু তখন মুমিন ও মুত্তাকীদের জন্যে জাহান্নাম শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যাবে; যেমন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর জন্যে নমরূদের অগ্নিকুণ্ডকে শীতল ও শান্তিদায়ক করে দেয়া হয়েছিল। এরপর মুমিনদেরকে এখান থেকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। আয়াতের পরবর্তী ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا বাক্যের অর্থ তাই।

خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا এখানে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার উদ্দেশে কাফেররা মুসলমানদের সামনে দু'টি বিষয় উপস্থাপিত করেছে। (এক) পার্থিব ধন-দৌলত ও সাজ-সরঞ্জাম এবং (দুই) চাকর-নওকর, দলবল ও পারিষদবর্গ। এসব বস্তু মুসলমানদের তুলনায় কাফেরদের কাছে বেশী ছিল। এ দু'টি বস্তুই মানুষের জন্যে নেশা হিসাবে কাজ করে এবং এগুলোর অহমিকাই ভাল ভাল জ্ঞানী ও সুধীজনকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে। এ নেশাই মানুষের সামনে বিগত যুগের বড় বড় পুঁজিপতি ও রাজ্যাধিপতিদের দৃষ্টান্তমূলক ইতিহাস বিস্মৃতি করিয়ে তার বর্তমান অবস্থাকে তার ব্যক্তিগত গুণ-গরিমার ফল এবং স্থায়ী শান্তির উপায়রূপে প্রতিভাত করে দেয়। অবশ্য তাদের কথা স্বতন্ত্র, যারা কোরআনী শিক্ষা অনুযায়ী পার্থিব ধন-দৌলত মান-সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তিকে ব্যক্তিগত গুণ-গরিমার ফল অথবা চিরস্থায়ী সাথী মনে করে না; সাথে সাথে মুখেও আল্লাহ্ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, আল্লাহ্ প্রদত্ত নেয়ামত ব্যয় করার কাজেও আল্লাহ্র বিধি-বিধান মেনে চলে এবং কোন সময় গাফেল হয় না। তারাই শুধু পার্থিব ধন-দৌলতের অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকতে পারে। উদাহরণতঃ অনেক পয়গম্বর, যেমন হযরত সোলায়মান (আঃ), হযরত দাউদ (আঃ) এবং অনেক বিত্তশালী সাহাবী, উম্মতের মধ্যকার অনেক ওলী ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তাআলা অতুল বিত্তবৈভব দান করেছেন এবং সাথে সাথে ধর্মীয় সম্পদ ও অপরিমেয় আল্লাহ্ ভীতিতেও তাদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন।

কাফেরদের এই বিভ্রান্তি কোরআন পাক এভাবে দূর করেছে যে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী নেয়ামত ও সম্পদ আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামত নয় এবং দুনিয়াতেও একে কোন ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠার লক্ষণ মনে করা হয় না। কেননা, দুনিয়াতে অনেক নির্বোধ মূর্খও এগুলো জ্ঞানী ও বিদ্বজ্জনের চাইতেও বেশী লাভ করে। বিগত যুগের ইতিহাস খুঁজে দেখলে এ সত্য উদঘাটিত হবে যে, পৃথিবীতে এ পরিমাণ তো বটেই, বরং এর চাইতেও বেশী ধন-দৌলত স্তূপীকৃত হয়েছে।

চাকর-নওকর, বন্ধু-বান্ধব ও পারিষদবর্গের আধিক্য সম্পর্কে বলা যায় যে, প্রথমতঃ দুনিয়াতেই তাদের অন্তঃসারশূন্যতা ফুটে উঠে অর্থাৎ, বিপদের মুহূর্তে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন কোন কাজে আসে না। দ্বিতীয়তঃ যদি দুনিয়াতে তারা সেবাকর্মে নিয়োজিতও থাকে, তবুও তা কয়দিনের জন্যে? মৃত্যুর পর হাশরের মাঠে কেউ কারো সঙ্গী সাথী হবে না।

وَيَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدًى ۗ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ
خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿٧٦﴾ اَفَرَءَيْتَ الَّذِيْ كَفَرَ
بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا ﴿٧٧﴾ اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ
عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ﴿٧٨﴾ كَلَّا ۗ سَنَكْتُبُ مَا يَقُوْلُ وَنَمُدُّ لَهٗ مِنَ
الْعَذَابِ مَدًّا ﴿٧٩﴾ وَّنَرِثُهٗ مَا يَقُوْلُ وَيَاْتِيْنَا فَرْدًا ﴿٨٠﴾ وَاتَّخَذُوْا
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا ﴿٨١﴾ كَلَّا ۗ سَيَكْفُرُوْنَ
بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٢﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّاۤ اَرْسَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ
عَلَى الْكٰفِرِيْنَ تَؤُزُّهُمْ اَزًّا ﴿٨٣﴾ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۗ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿٨٤﴾
يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا ﴿٨٥﴾ وَّنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ
اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿٨٦﴾ لَا يَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ
الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ﴿٨٧﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْـًٔا
اِدًّا ﴿٨٩﴾ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ
هَدًّا ﴿٩٠﴾ اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ﴿٩١﴾ وَمَا يَنْۢبَغِيْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾
اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّاۤ اٰتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾ لَقَدْ
اَحْصٰىهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾ وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ﴿٩٥﴾

(৭৬) যারা সৎপথে চলে আল্লাহ্ তাদের পথপ্রাপ্তি বৃদ্ধি করেন এবং স্থায়ী সৎকর্মসমূহ তোমার পালনকর্তার কাছে সওয়াবের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিদান হিসেবেও শ্রেষ্ঠ। (৭৭) আপনি কি তাকে লক্ষ্য করেছেন, যে আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে না এবং বলে ঃ আমাকে অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি অবশ্যই দেয়া হবে। (৭৮) সে কি অদৃশ্য বিষয় জেনে ফেলেছে, অথবা দয়াময় আল্লাহ্র নিকট থেকে কোন প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হয়েছে? (৭৯) না, এটা ঠিক নয়। সে যা বলে আমি তা লিখে রাখব এবং তার শাস্তি দীর্ঘায়িত করতে থাকব। (৮০) সে যা বলে, মৃত্যুর পর আমি তা নিয়ে নেব এবং সে আমার কাছে আসবে একাকী। (৮১) তারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য ইলাহ গ্রহণ করেছে, যাতে তারা তাদের জন্যে সাহায্যকারী হয়। (৮২) কখনই নয়, তারা তাদের এবাদত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিপক্ষে চলে যাবে। (৮৩) আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে, আমি কাফেরদের উপর শয়তানদেরকে ছেড়ে দিয়েছি। তারা তাদেরকে বিশেষভাবে (মন্দকর্মে) উৎসাহিত করে। (৮৪) সুতরাং তাদের ব্যাপারে আপনি তাড়াহুড়া করবেন না। আমি তো তাদের গণনা পূর্ণ করছি মাত্র। (৮৫) সেদিন দয়াময়ের কাছে পরহেযগারদেরকে অতিথিরূপে সমবেত করব, (৮৬) এবং অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব। (৮৭) যে দয়াময় আল্লাহ্র কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে, সে ব্যতীত আর কেউ সুপারিশ করার অধিকারী হবে না। (৮৮) তারা বলে ঃ দয়াময় আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। (৮৯) নিশ্চয় তোমরা তো এক অদ্ভুত কাণ্ড করেছ। (৯০) হয় তো এর কারণেই এখনই নভোমণ্ডল ফেটে পড়বে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হবে এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে। (৯১) এ কারণে যে, তারা দয়াময় আল্লাহ্র জন্যে সন্তান আহবান করে। (৯২) অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভনীয় নয়। (৯৩) নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে কেউ নেই যে, দয়াময় আল্লাহ্র কাছে দাস হয়ে উপস্থিত হবে না। (৯৪) তাঁর কাছে তাদের পরিসংখ্যান রয়েছে এবং তিনি তাদেরকে গণনা করে রেখেছেন। (৯৫) কেয়ামতের দিন তাদের সবাই তাঁর কাছে একাকী অবস্থায় আসবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لَاُوْتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا বোখারী ও মুসলিমের হযরত খাব্বাব ইবনে আরতের রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তিনি 'আস ইবনে ওয়ায়েল কাফেরের কাছে কিছু পাওনার তাগাদায় গেলে সে বলল ঃ তুমি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি ঈমান প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করব না। খাব্বাব জওয়াব দিলেন ঃ এরূপ করা আমার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়, চাই কি তুমি মরে পুনরায় জীবিত হতে পার। আ'স বলল ঃ ভালো তো, আমি কি মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হব? এরূপ হলে তাহলে তোমার ঋণ তখনই পরিশোধ করব। কারণ, তখনও আমার হাতে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি থাকবে।—(কুরতুবী)

কোরআন পাক এই আহাম্মক কাফেরের জওয়াবে বলেছে ঃ সে কিরূপে জানতে পারল যে, পুনরায় জীবিত হওয়ার সময়ও তার হাতে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি থাকবে? اَطَّلَعَ الْغَيْبَ সে কি উঁকি মেরে অদৃশ্যের বিষয়সমূহ জেনে নিয়েছে? اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا অথবা সে দয়াময় আল্লাহ্র কাছ থেকে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততির কোন প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে? বলাবাহুল্য, এরূপ কোন কিছুই হয়নি। এমতাবস্থায় সে মনে এরূপ ধারণা কিরূপে বদ্ধমূল করে নিয়েছে? وَنَرِثُهٗ مَا يَقُوْلُ অর্থাৎ, সে যে, ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততির কথা বলেছে, তা পরকালে পাওয়া তো দূরের কথা দুনিয়াতেও সে যা প্রাপ্ত হয়েছে, তাও ত্যাগ করতে হবে এবং অবশেষে আমিই তার অধিকারী হব। অর্থাৎ এই ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি তার হস্তচ্যুত হয়ে অবশেষে আল্লাহ্র কাছে ফিরে যাবে।

وَيَاْتِيْنَا فَرْدًا কেয়ামতের দিন সে একা আমার দরবারে উপস্থিত হবে। তার সাথে তখন না থাকবে সন্তান-সন্ততি এবং না থাকবে ধন-দৌলত।

وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا অর্থাৎ, এই স্বহস্তনির্মিত মূর্তি এবং মিথ্যা উপাস্য, সহায় হওয়ার আশায় কাফেররা যাদের এবাদত করত, তারা এই আশার বিপরীত তাদের শত্রু হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে বাকশক্তি দান করবেন এবং তারা বলবে ঃ ইয়া আল্লাহ্, এদেরকে শাস্তি দিন। কেননা, এরা আপনার পরিবর্তে আমাদেরকে উপাস্য করে নিয়েছিল।

تَؤُزُّهُمْ اَزًّا আরবী অভিধানে حض - فز - از - هز শব্দগুলো একই অর্থে ব্যবহৃত হয়; অর্থাৎ কোন কাজের জন্যে উৎসাহিত করা। লঘুতা, তীব্রতা ও কম-বেশীর দিক দিয়ে এগুলোর মধ্যে পারস্পরিক তারতম্য রয়েছে। از শব্দের অর্থ পূর্ণ শক্তি, কৌশল ও আন্দোলনের মাধ্যমে কাউকে কোন কাজের জন্যে প্রস্তুত বরং বাধ্য করে দেয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, শয়তানেরা কাফেরদেরকে মন্দ কাজে প্রেরণা যোগাতে থাকে, মন্দ কাজের সৌন্দর্য অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে দেয় এবং অনিষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে দেয় না।

اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا উদ্দেশ্য এই যে, আপনি তাদের শাস্তির ব্যাপারে তাড়া-হুড়া করবেন না। শাস্তি সত্বরই হবে। কেননা, আমি তাদেরকে দুনিয়াতে বসবাসের জন্যে যে গুনাগুনতি দিন ও সময় দিয়েছি, তা দ্রুত পূর্ণ হয়ে যাবে। এরপর শাস্তিই শাস্তি। نَعُدُّ لَهُمْ অর্থাৎ, আমি তাদের